প্রধানমন্ত্রী প্রদর্শিত
কর্মসংস্থানের সুযোগ

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে
হিন্দুত্ববাদী আস্ফালন

ডিসেম্বর'১৭-জানুয়ারি'১৮ ■ ৪৬তম বর্ষ ■ অষ্টম-নবম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

শিক্ষামন্ত্রীকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ৫/১৮ তারিখ ঃ ১২.০১.২০১৮

মাননীয়
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

মহাশয়,

আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, বিগত সময়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে আমরা আপনার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করি। বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ পে-কমিশন দ্রুত চালু করা সহ কিছু ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের নিয়মিত করা, চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা প্রদান, হেলথ স্কীমে চিকিৎসার বর্ধিত খরচ প্রশাসনিক জটিলতায় বিলের অর্থ (re-imbursement) পেতে (concerned office and Medical Cell) অযথা বিলম্ব হওয়া, Cash Less-র সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা করা, হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ করাসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণে আপনাকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করছি।

ইতিমধ্যে আপনার চাহিদা মতো আমরা মহার্ঘভাতা ও পে-কমিশন প্রায় সব রাজ্যের আপ-টু-ডেট তথ্য ও ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের আদেশনামা আপনাকে প্রেরণ করেছি।

আশা করি, আপনি গুরুত্ব দিয়ে কর্মচারী ও তাদের পরিবারের স্বার্থে এই মুহূর্তে বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ পে-কমিশন দ্রুত চালু করা, হেলথ স্কীমে চিকিৎসার বর্ধিত খরচ নির্দিষ্ট সময়ে (ষাট দিনের মধ্যে) (re-imbursement) করার যথাযথ উদ্যোগসহ উপরিউক্ত দাবিগুলির মীমাংসা করার লক্ষ্যে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

৫ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যৌথ সমাবেশ

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিজয় শংকর সিংহ

নয়া পেনশন ব্যবস্থা বাতিল ও অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতনের দাবীতে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অবিলম্বে বকেয়া ৫৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান ও ষষ্ঠবেতন কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে প্রকাশ ও বেতন কমিশন কার্যকর করার দাবীকে যুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমূহের কোন-অর্ডিনেশন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের কোন-অর্ডিনেশন কমিটির যৌথ আহ্বানে কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বিগত ৫ ডিসেম্বর ২০১৭, কলকাতার রানী রাসমনি এভিনিউতে সমাবেশ পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি জনার্দন পালকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সমাবেশের শুরুতে কর্মচারী আন্দোলনের শহীদ কাজল ব্যানার্জি ও প্রয়াত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুকোমল সেনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে নীরবতা পালন করা হয়। সমাবেশে দাবী প্রস্তাব উত্থাপন করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন, এ রাজ্যে আগে কোনও সরকারের পক্ষ থেকে নিজেদের কর্মচারীদের আন্দোলন ভাঙতে এভাবে পুলিশকে ব্যবহার করা হয়নি, যা বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। বিগত ১৬ নভেম্বর পে-কমিশন দপ্তর অভিযানের দিন পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দিয়েছেন কর্মচারী সমাজ, সরকারের পক্ষ থেকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ এনে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। স্বাস্থ্যভবনে অনৈতিক বদলীর নির্দেশিকার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় পুলিশের ধস্তাধস্তির জেরে খুন হয়েছেন স্বাস্থ্যভবনের কর্মচারী কাজল ব্যানার্জী। পশ্চিমবঙ্গের আপামর কর্মচারী সমাজ প্রস্তুতি নিচ্ছেন দাবি আদায়ে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক পীযূষ রায় বলেন ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকার নয়া পেনশন পনরকল্প কার্যকরি করার বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ডিফাইন্ড বা বিধিবদ্ধ পেনশন ব্যবস্থাকে তুলে দেবার চেষ্টা জোর গতি পেয়েছে মোদী সরকারের আমলে। নয়া পেনশন ব্যবস্থার নেশন ফান্ড কর্পোরেটদের হাতে চলে যাবে, শেয়ার বাজারের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থায় অবসরপ্রাপ্তদের শেষ সঞ্চয় চলে যাবে। নয়া পেনশন ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে ও

সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

প্রয়াত সুকোমল সেনকে শ্রদ্ধায় স্মরণ

২২ নভেম্বর ২০১৭, বুধবার, দীর্ঘ অসুস্থতার পর কলকাতার এক বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন

এ শ্রীকুমার

মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা কমরেড সুকোমল সেন।

গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ডাইরেক্টরেট সমিতির উদ্যোগে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অসিত ভট্টাচার্য ও

সুবিমল সেন

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। প্রথমেই শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অসিত ভট্টাচার্য এবং নীরবতা পালন করা হয়। এই স্মরণসভা শুরু হয় কমরেড সুকোমল সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সুকোমল সেনের ভাই ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ সুবিমল সেন, স্ত্রী রমা সেন, পুত্র রাহুল সেন এবং পুত্রবধূ মালা সেন। শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ, সারা ভারত রাজ্য সরকারী

মঞ্জুল কুমার দাস

কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব মনোজ কান্তি গুহ, জনার্দন রেড্ডি, মঞ্জুল দাস, অসিত ভট্টাচার্য, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল পাত্র, কেন্দ্রীয় সরকারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে পীযূষ রায়, ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে সমীর ভট্টাচার্য, এবিটিএ-র সম্পাদক কৃষ্ণ প্রসন্ন ভট্টাচার্য, এবিপিটিএ-র রাজ্য সম্পাদক সমর চক্রবর্তী ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিভুক্ত

বিজয় শংকর সিংহ

সংগঠনগুলির নেতৃত্ববৃন্দ।

কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রিয় নেতা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন মত ও পথের নেতৃত্বকে একই সূত্রে গেঁথে একই মঞ্চে তাদের সংগঠিত করেছিলেন তিনি। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় মঞ্চ তথা আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

তাঁর স্মৃতিচারণায় ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ

নিখিল পাত্র

সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

কমরেড মহম্মদ আমীনের জীবনাবসান

আক্ষরিক অর্থেই শিশু শ্রমিক থেকে মেহনতীদের সর্বোচ্চ সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য হওয়ার অনন্য নজীর সৃষ্টিকারী কমরেড আমিন প্রয়াত হলেন ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সোমবার ৯০ বছর বয়সে। বেলা ২টা ৪০ মিনিটে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে মেহনতী মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের একটা বর্ণময় যুগের সমাপ্তি ঘটল, একই সাথে তাঁর স্মৃতি আর কর্মচিন্তায় শপথ গ্রহণ করলো অগনিত মেহনতী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। কমরেড আমিনের জন্ম পরাধীন ভারতে ১৯২৮ সালে উত্তরপ্রদেশের বারানসী জেলার জৈলার গ্রামে। দারিদ্রের কারণে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, এমনকি কৈশোরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে যখন জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার অফিস কারখানা থেকে বহু মানুষ ভয়ে গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছিলেন সেইরকম উত্তপ্ত পরিবেশেই তাঁর বাবা তাঁকে এবং তাঁর দাদাকে চটকলের মেশিনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে কর্মজীবনের শুরু। শুরু মেহনতীদের প্রত্যক্ষ নির্যাতনের সাক্ষী হওয়া এবং প্রতিবাদ প্রতিরোধে শামিল হওয়া। সেখানেই বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য থেকে ১৯৪৮ সালে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ।

কমরেড আমিন বরানগর এলাকায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে

রাজ্যে অনেক দপ্তরের মন্ত্রী থেকে সি. আই. টি. ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক থেকে ২০০৮ সালে পলিটব্যুরো সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ একেবারে মাটির কাছাকাছি সাবলীলভাবে বিচরণ করতে পারতেন মুখে সদা মৃদুহাসি আর উর্দু শায়রিতে ছিল সহজাত দক্ষতা তার মজ্জাগত। ঢাকা রাজশাহী প্রভৃতি জেলখানায় তাঁর জীবনের একটা অংশ কেটেছে সেখানেও তাঁর নিজস্বতা তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

কমরেড আমিন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির শিলিগুড়ি সম্মেলনে উপস্থিত থেকে যে দিকনির্দেশ করেছেন তা পাথেয় হয়ে থাকবে সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বদের চেতনায়। বিশেষ করে তাঁর সংগঠকদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরে যে মনোবল প্রদান করেন তাতে তিনি চিরভাস্বর থাকবেন কর্মচারীদের সংগঠকদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। তাঁর রচিত শায়রি নিয়ে উর্দু কবিতার সঙ্কলন 'সদাই বেদারি', আত্মজীবনী 'জীবনের ধূপছাও' সহ বিভিন্ন উপন্যাসের অনুবাদ আগামী ও বর্তমান প্রজন্মের কাছে চির আদৃত থাকবে। গোটা দেশের শ্রমজীবি মেহনতীদের সংগঠনের শোকার্তার সাথে সাথে আমরাও কমরেড আমিনের স্মৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর কর্মচিন্তায় আত্মস্থ থেকে মেহনতীদের স্বার্থে আজীবন কাজ করার শপথ গ্রহণ করছি। □

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় সরকারের 'জুমলা' বাজেট

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে, যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভারতীয় জনতা পার্টি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষ থেকে মানুষের সামনে রাখা হয়েছিল, যেমন বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গোপন অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত অর্থের (অসাধু উপায়ে উপার্জিত কালো টাকা) মালিকদের তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং সেই অর্থ দেশে ফিরিয়ে এনে প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকলে, খোলানো হবে)। তাদের তৎকালীন হিসেব অনুযায়ী এর ফলে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ঢোকার কথা। পড়ে পাওয়া চোদ্দা আনার মতো, এই প্রচারে কেউ কেউ হয়তো উৎফুল্লও হয়েছিলেন। হওয়াটা অস্বাভাবিকও নয়। কারণ এককালীন ১৫ লক্ষ টাকা চাক্ষুষ করেছেন, এমন মানুষের এদেশে সংখ্যা খুব বেশি নয়।

দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল, বছরে ২ কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। যে দেশে কর্মহীনের সংখ্যা বিপুল, সে দেশের মানুষের উপর এই প্রতিশ্রুতির প্রভাব কতখানি পড়তে পারে, তা অনুমান করা দুষ্কর নয়।এমনকি একথাও বলা যায়, ১৫লক্ষ টাকা করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার প্রতিশ্রুতি যত না মানুষ বিশ্বাস করেছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি মানুষ বিশ্বাস করেছিলেন এই প্রতিশ্রুতিটিকে। বিশেষ করে কর্মপ্রার্থী যুব সমাজের ওপর এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই ছিল ব্যাপক।

তৃতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল, নির্বাচন পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে (২০১৬) কৃষকের তৎকালীন গড় আয়কে দ্বিগুণ করা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও কৃষির উপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমস্যাও কৃষকের জীবনে নিত্যসঙ্গী। কিন্তু নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার পরে (১৯৯১ সালের পারে) সমস্যা সঙ্কটে পর্যবসিত হয়েছে। ফসলের ন্যায্যদাম না পেরে এবং মহাজনী ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে কৃষকের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা, উদারবাদ পর্বে কৃষি সঙ্কটের দৈনন্দিন পরিণতি। প্রাক উদারবাদ পর্বে জমির মালিকানার প্রশ্নে কেন্দ্রীভবনকে বজায় রাখা, কার্যকরী ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ না করা (আমূল ভূমি সংস্কার তো দূরের কথা, এমনকি ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত প্রণীত আইনগুলিকেও সঠিকভাবে রূপায়ণে সদিচ্ছার অভাব ইত্যাদি কারণে দরিদ্র কৃষক, ক্ষেত মজুরদের জীবনে সমস্যা তো ছিলই। কিন্তু সেচ, সার, বীজ প্রভৃতি যোগানে সরকারি সহায়তা, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার (সবুজ বিপ্লব) প্রভৃতি কারণে কৃষকের দূরবস্থা আত্মহত্যার পর্যায়ে সাধারণভাবে পৌঁছোয় নি। কিন্তু নয়া উদারনীতি চালু হওয়ার পরে, সরকারী সহায়তা ধাপে ধাপে প্রত্যাহৃত হওয়ার ফলে এবং কৃষিতে দেশি-বিদেশী বেসরকারী পুঁজির অনুপ্রবেশ, কৃষিপণ্যের আগাম বাণিজ্য ইত্যাদি কারণে সমস্যা ঘনীভূত হয়ে কৃষক সমাজকে নিদারুণ সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। স্বভাবতই, এমতাবস্থায় যদি কোন রাজনৈতিক দল কৃষকের আয়কে দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয়, তাহলে তা কৃষক সমাজকে আকৃষ্ট করবেই। এবং করেও ছিল। এই প্রতিশ্রুতিগুলি তো ছিলই, সর্বোপরি ছিল শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে গরিবের মসীহা রূপে হাজির করা। ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতিওয়ালা এমন একজন মানুষ যিনি চাইলেই একার হাতে সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন।

প্রাক্-নির্বাচনী উল্লিখিত মন ভোলানো প্রতিশ্রুতিদর সাথে, নির্বাচিত হওয়ার পর যুক্ত হয়েছিল—'অচ্ছে দিন', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' প্রভৃতি স্লোগান। কিন্তু প্রতিশ্রুতি, আর স্লোগান সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মেলেনি। যতদিন গেছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ থেকে হতাশা, হতাশা থেকে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, ঘটছে কখনও বিভিন্ন নির্বাচনে-উপ নির্বাচনে, আবার কখনও, মাঠে-ময়দানে কলে-কারখানায়। যাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এখন প্রশ্নের মুখে পড়ে, তাঁরা বলছেন—ওগুলি ছিল 'নির্বাচনী জুমলা'। 'জুমলা' অর্থাৎ শুধু বলার জন্য বলয় করার জন্য বলা নয়।

বর্তমান সরকারের অঅমলে ধর্মীয় মেরুকরণ বা সামাজিক অস্থিরতার যে অসহনীয় বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, এই আলোচনায় সেই প্রসঙ্গটিকে বাদ রাখলেও শুধুমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি ও এদেশের কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থবাহী একমুখী নীতি দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় একদিন যাঁরা উদ্বাহু হয়ে নরেন্দ্র মোদীর গুণগান করেছিলেন, তাঁদেরও একদল মৃদু সমালোচনা শুরু করেন। পরবর্তীতে 'ডি-মনিটাইজেশন', 'জি এস টি' প্রভৃতি সিদ্ধান্ত, অর্থনীতির নিম্নমুখী গতিকে আরও বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

একদিকে অর্থনৈতিক সঙ্কটের এই প্রেক্ষিত, অপরদিকে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করার সুযোগ। এই দুইয়ের মধ্যে কিভাবে অর্থমন্ত্রী ভারসাম্য রক্ষা করবেন—বিশেষজ্ঞদের প্রাক্ বাজেট আলোচনার বিষয় ছিল তাই। তিনি কী আর্থিক সংস্কারের প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করবেন, না কি নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সামাজিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির মতো জনপ্রিয় রাস্তা বেছে নেবেন? এই প্রশ্নে উত্তপ্ত চর্চা শুরু হয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকার পাতা জুড়ে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে তাই এবারের বাজেট ছিল, একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। একদিকে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি ও কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে আর্থিক সংস্কারের প্রতি দায়বদ্ধতার যে নজির বর্তমান এন ডি এ সরকার সৃষ্টি করেছে, তাকে বজায় রাখা। কারণ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি-র ক্ষমতায় আরোহণে এদের বিপুল সহযোগিতা ছিল। স্বভাবতই বিগত প্রায় চার বছরে, আর্থিক ঘাটতিকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা, বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে এবং বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদারীকরণ, বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারীকরণের একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কর্পোরেট লবিকে খুশি রাখতেই। বাজেট পেশ করতে গিয়ে দুম করে তাদের চটানো যাবে না। আবার সাধারণ মানুষের মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে, যার কিছুটা প্রতিফলন পড়েছে গুজরাটের নির্বাচনে, তাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যাবে না। কিন্তু যে বাজেট পেশ হয়েছে, তাতে স্পষ্ট, অর্থমন্ত্রী শুধুমাত্র ভিত্তিহীন প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করেছেন। জনসমাজের বৃহৎ অংশ, বিগত কয়েক বছরে যাদের আয়ে স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, বা হ্রাস পেয়েছে, তাদের আয় বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা করতে অর্থমন্ত্রী ব্যর্থ হয়েছেন। যেমন, গ্রামীণ অর্থনীতি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং প্রান্তিক মানুষদের জন্য বাজেটে প্রচুর কথা বলা হলেও, কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্প কার্যকরী করার প্রকৃত পরিকল্পনা ও উপযুক্ত পরিমাণ বাজেট বরাদ্দের প্রশ্নে কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন।

অর্থমন্ত্রী বাজেটে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারিত হবে। তাঁর ঘোষণা হলো, ইতিমধ্যেই রবিশস্যের ক্ষেত্রে এই সুপারিশ মানা হয়েছে, এবার খরিফ শস্যের ক্ষেত্রেও তা চালু করা হবে। কিন্তু তিনি যা বলেন নি, তা হলো কোন উৎপাদন মূল্যকে ধরা হবে? স্বামীনাথনের নেতৃত্বাধীন কমিশন তিন ধরনের উৎপাদন মূল্যের কথা বলেছে। ১। A_2—কৃষক ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সার, বীজ ইত্যাদি বাবদ যা খরচ করেছে। ২। $A_2 + F_L$—যেখানে সার, বীজ ইত্যাদি বাবদ খরচের পাশাপাশি পারিবারিক শ্রমকে যুক্ত করা হয়েছে, এবং ৩। C_2—যেখানে আরও যুক্ত হয়েছে জমির খাজনা এবং ঋণের ওপর প্রদত্ত সুদ। যদি শুধুমাত্র A_2 কে ধরা হয় তাহলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যা দাঁড়ায়, তা কৃষকেরা ইতোমধ্যে পাচ্ছেন এবং তা যথেষ্ট নয়। আর $A_2 + F_L$ বা C_2 কে ধরে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করলে, যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়নি।

খাদ্যে ভর্তুকির প্রশ্নে বাজেট বরাদ্দ যতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে, তার একটা বড় অংশই চলে যাবে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের বকেয়া পরিশোধ করতে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না, কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে সরকার খুব বেশি আন্তরিক নয়।

কৃষি ছাড়াও আরও কতগুলি ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে অনেক কথা বলা হলেও, ২০১৭-১৮ সালের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০১৮-১৯ সালের প্রস্তাবিত বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৭ শতাংশ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বৃদ্ধি যৎসামান্য। সঙ্কটগ্রস্ত একটি ক্ষেত্রকে বাঁচাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে, অর্থমন্ত্রী প্রতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগকে বৃদ্ধি করেছেন। ১০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ১১ লক্ষ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও এই টাকা সরকারের নয়, ব্যাঙ্কের। যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি ইতিমধ্যেই সঙ্কটে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এবারের বাজেটে অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আরও একটি প্রকল্পের ঘোষণা অর্থমন্ত্রী করেছেন। যা তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, 'বিশ্বের বৃহত্তম সরকার পোষিত স্বাস্থ্য প্রকল্প'। এই প্রকল্পে দরিদ্র ১০ কোটি পরিবার (প্রায় ৫০ কোটি মানুষ) হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সাধারণ বা দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ পাবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এর জন্য কত অর্থের প্রয়োজন হতে পারে পারে, তার কোনো হিসেব নেই। চালু করার জন্য কোন অতিরিক্ত বরাদ্দও করা হয়নি। এমনকি বীমা কোম্পানিগুলির সাথে এই বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা তাও জানা যায়নি। বাজেটে প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের দায় রাজ্য সরকারের থাকবে। অথচ ঘোষণা করার আগে রাজ্য সরকারগুলির সাথে আলোচনাও করা হয়নি। পরিকল্পনাহীন এই স্বাস্থ্য প্রকল্প, আদতে যা কিছু বেসরকারী বীমা কোম্পানীর মুনাফার রাস্তা খুলে দিতে পারে, তার পরিবর্তে সরকারী উদ্যোগে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সম্প্রসারিত করা অনেক বেশি কার্যকরী হতো।

একইভাবে বাজেটে গরিবের নিজস্ব বাড়ির স্বপ্ন পূরণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ। 'রেগা' প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ গত আর্থিক বছরের ন্যায় একই রাখা হয়েছে (৫৫,০০০ কোটি টাকা)। মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রকল্পের বর্তমান সময়ে মূল সমস্যা হলো চাহিদার অভাব ও মুনাফার নিম্ন অথবা ঋণাত্মক হার। কিন্তু বাজেটে এই বিষয়গুলির প্রতি নজর না দিয়ে, মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্য ঋণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা এবং ২০১৫-১৬ সালে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয় সে কোম্পানিগুলির, তারা যে হারে (২.৫%) মুনাফার ওপর কর দিতেন, সেই একই হারে ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে বাৎসরিক ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত আয় করেছে এমন কোম্পানিগুলিও মুনাফার ওপর কর দেবেন। এর ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে সরকারের ৭০০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কোম্পানিগুলির কর উত্তর মুনাফা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রশ্নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা, তা স্পষ্ট নয়।

এক কথায় বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে প্রচুর কথার অবতারণা করে, প্রকৃত বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিদারুণ কৃপণতা প্রদর্শন করেও, ২০১৮-১৯ সালে আর্থিক ঘাটতি ধরা হয়েছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.৩ শতাংশ। যা সরকারের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা ৩ শতাংশের থেকে অনেকটাই বেশি।

এই কেন্দ্রীয় বাজেট দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সমস্যার প্রকৃত সুরাহার পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনসহ বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে গরিব দরদীর একটা মুখোশ পড়তে হয়েছে। ফলে সংস্কারপন্থীর ভাবমূর্তিটা কিছুটা আড়াল করতে হয়েছে। যা আবার শেয়ার বাজারকে ধাক্কা দিয়েছে। অর্থাৎ মাননীয় অর্থমন্ত্রী নির্বাচনী জুমলা করতে গিয়ে কাউকেই খুশি করতে পারেন নি। □

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

তেলেভাজা-পকোড়া কাহিনী

'বার্ডস অফ এ ফেদার, ফ্লক টুগেদার'— এই ইংরাজী প্রবচনটির নিগলিতার্থ হইল সমচরিত্রের জীব চলনে বলনে সমদিশা অনুসরণ করিয়া থাকে। বলাই বাহুল্য, জীবগোষ্ঠীর মধ্যে মনুষ্য প্রজাতিও অন্তর্ভুক্ত। এহেন প্রবচনটির সার্থক দৃশ্যায়ণ সাম্প্রতিককালে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইতেছি। উল্লেখ্য, দৃশ্যায়ণের দুই কুশীলব হইলেন মদীয় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মদীয় দেশের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী। তাহাদের সাদৃশ্য সহজেই প্রতিনিয়ত নজরে আসিতেছে। শুধুমাত্র আচার ব্যবহার নয়, নীতির প্রশ্নেও উভয়ে একই পথের পথিক। যেমন ধরা যাউক কর্মহীনতার সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গটি। উভয়েই তাঁহাদের নির্বাচনী প্রচারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। জনগণের সমর্থন লাভ করিয়া ক্ষমতায় আসিলে তাঁহারা ফি বৎসর প্রভূত পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিবেন ও অচিরেই সমাজজীবনে প্রোথিত এই সুগভীর সমস্যাটি উৎপাটিত হইবে। রাজ্য ও কেন্দ্রের ক্ষমতার মসনদে তাহারা বসিয়াছেন। মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কণামাত্রও বাস্তবায়িত হয় নাই। রাজ্যে ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বেকারত্বের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে স্ফীতকায় হইতেছে। শুধুমাত্র অদ্যাবধি যাঁহারা কর্মহীন রহিয়াছেন, তাঁহারাই নন, কিয়ৎকাল পূর্বেও যাঁহারা কর্মরত ছিলেন, তাঁহারাও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতির পরিণতিতে কর্মহীনতার শিকার হইতেছেন অহরহ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কৃষি অর্থনীতির সঙ্কট, ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে বৃদ্ধির স্থবিরতা, সমায়ান্তরে ঋণাত্মক বৃদ্ধি ইত্যাদির সমস্যা কর্মহীনতার সমস্যাকে বৃদ্ধি করিতেছে। পাশাপাশি বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো যুক্ত হইয়াছে 'ডিমনিটাইজেশন'। অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রায় ৪৫ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী নোট বাতিলের ধাক্কায় কর্মহীনতার শিকার হইয়াছেন। সর্বভারতীয় চরিত্রের উপরোক্ত সমস্যাবলীর প্রকোপ স্বভাবতই এই রাজ্যের অর্থনীতিকে গ্রাস করিয়াছে। অতিরিক্ত উপাদান হিসাবে যুক্ত হইয়াছে রাজ্য সরকারের নীতির প্রশ্নে দিশাহীনতা। প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিগণ আসিতেছেন, আকর্ণ বিস্তৃত হাস্য সহযোগে ফটো তুলিতেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগী ভূমিকাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু নতুন শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রশ্নে তাহাদের ভূমিকা কার্যত শূন্য। রাজ্যে নতুন শিল্প সম্ভাবনার উন্মেষ তো দূর অস্ত, প্রাচীন শিল্পগুলিও এক এক করিয়া পাততাড়ি গুটাইতেছে। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় নীতির কারণে দেশব্যাপী কর্মহীনতায় অমানিশা সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা মদীয় রাজ্যে গাঢ়তর হইয়াছে রাজ্য সরকারের নীতির কারণে। কেন্দ্র ও রাজ্যর নীতিহীনতার যুগলবন্দী শাঁখের করাতের ন্যায় কর্মপ্রার্থীদের স্বার্থকে উভয় দিক হইতে কাটিতেছে। কিন্তু সাদৃশ্য শুধুমাত্র নীতিগত প্রশ্নেই নহে। কর্মহীনতার সমস্যা দূরীভূত করিবার প্রশ্নেও উভয়ের চিন্তার সাদৃশ্য বিস্ময়কর। কিয়ৎকাল পূর্বে মদীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কর্মপ্রার্থীদের পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, চপ তথা তেলে ভাজার দোকান খুলিয়া নিজ আয়ের সংস্থান করিতে। শুধুমাত্র পরামর্শই নহে, তেলেভাজা শিল্পে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা লব্ধ উপমাও হাজির করিয়াছিলেন। তাহা হইল, তাঁহার বাসস্থান অঞ্চলে কোনো এক তেলেভাজা ব্যবসায়ী সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন। অবশ্য তেলেভাজা ব্যবসায়ীর বাড়ির গ্যারাজে বা দোকানের সম্মুখে কোনো বিদেশি মূল্যবান গাড়ি দাঁড়াইয়া থাকে কিনা তাহা অবশ্য তিনি বলেন নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গটির বাহিরেও অর্থনীতির একটি কূটতর্ক রহিয়াছে, যাহার প্রতি আলোকপাত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কূটতর্কটি হইল, পশ্চিমবঙ্গে কর্মহীনতার পরিসংখ্যান হইতে ইহা স্পষ্ট হয় যে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই কোনো না কোনো সদস্য কর্মহীন রহিয়াছেন। স্বভাবতই কোনো একটি পরিবারের সদস্য তেলেভাজার দোকান খুলিলে ঐ পরিবারের অপর সদস্যগণ তাহা ক্রয় করিবেন নিকট আত্মীয়ের ব্যবসাটিকে লাভজনক করিবার জন্য। এমনভাবে প্রতিটি তেলেভাজার দোকানই হইবে নির্দিষ্ট পরিবার কেন্দ্রিক। অর্থাৎ ব্যবসা সম্প্রসারিত করিয়া মুনাফা বৃদ্ধির কোনো সুযোগ থাকিবে না। আর মুনাফা বৃদ্ধি না হইলে দশ তল গৃহ নির্মাণ হইবে কি করিয়া? মুখ্যমন্ত্রীর এ হেন পরামর্শ শুনিয়া যখন মদীয় রাজ্যের কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীগণ শিহরিত, ঠিক তখনই রাষ্ট্রের কর্ণধার সমগ্র দেশের কর্মপ্রার্থীদের সম্মুখে সমধর্মী প্রস্তাব রাখিলেন। তিনি পকৌড়া ভাজিয়া উপার্জন করিবার পরামর্শ দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এবংবিধ পরামর্শে এই রাজ্যের যুবক-যুবতীগণের অতিরিক্ত একটি সুযোগ প্রাপ্তি হইল। তাহারা একই পরিকাঠামো ব্যবহার করিয়া (তৈজসপত্র ইত্যাদি) দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্নে যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকারী ও রাজ্য সরকারী প্রকল্পে অংশীদার হইবার সুযোগ পাইলেন। □

৬ ফাল্গুন, ১৪২৪

প্রয়াত এস পি লেপচা

দার্জিলিং জেলার শ্রমজীবী মানুষের অকৃতিম বন্ধু সান্তদোপল লেপচা যিনি এস পি লেপচা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সকালে শিলিগুড়িতে প্রয়াত হন। ১৯২৭ সালে ১৫ মে জন্ম দার্জিলিংয়ের প্লাডভাঙ চা শ্রমিক বস্তিতে। প্রতিদিন জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং চা-বাগানের মেহনতীদের সংগ্রামী লড়িয়ে পরিবেশ তাকে সংগ্রামের ময়দানে সামনের সারিতে নিয়ে আসে। মাধ্যমিক পাশ করে চা-বাগানের স্কুলেই শিক্ষকতা করতে থাকেন একই সাথে চা-শ্রমিক আন্দোলনের সাথে এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনের সাথে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রাখেন। ৭ বছর শিক্ষকতা করার পর তাঁর চাকরি যায় মালিকপক্ষের সাথে বিরোধের জেরে। তিনি ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং রতনলাল ব্রাহ্মণের সাথে

মিলে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে সামিল হন। ১৯৮০ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্য এবং ১৯৯৯ সালে দার্জিলিং লোকসভা থেকে নির্বাচিত হন। গোর্খা পার্বত্য পরিষদ গঠনে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল। অজস্র আক্রমণের পরেও তিনি পাহাড়ের ভিটে ছেড়ে যাননি। সম্প্রতি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে শিলিগুড়িতে ছেলের বাড়িতে ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। কমরেড লেপচার মৃত্যুতে দার্জিলিং জেলার গণআন্দোলন এক আজীবন সেনানীকে হারাল। ফলে শোকাহত স্থানীয় মানুষসহ মেহনতীদের সাথে আমরাও। □

নয়া উদারবাদী অর্থনীতির দুটি কুফল—নতুন পেনশন ব্যবস্থা এবং স্থায়ী ও নিয়মিত চরিত্রের কাজে চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব

আজ ৫ ডিসেম্বর, ২০১৭, কলকাতার রানী রাসমণি এভিনিউতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী সমিতিসমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এই যৌথ অবস্থান সমাবেশ (বিকেল ৩-৬টা) গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছে যে, বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে, পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারগুলির তুলনায় অনেকবেশী বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে নয়া উদারবাদী অর্থনীতিকে কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার ক্ষতিকর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা প্রভৃতি উৎপাদনমূলক কোনো ক্ষেত্রেই নয়া উদারবাদের করাল গ্রাস থেকে আজ মুক্ত নয়।

অনেক পোশাকি কথার আড়ালে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি বা বিশ্বায়নের মূল মর্মবস্তু হল অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস ও হস্তক্ষেপের সুযোগকে সঙ্কুচিত করে বাজারের ভূমিকাকে প্রসারিত করা ও জনসমাজের মধ্যে বাজার নির্ভরতা গড়ে তোলা। এই কাজ করা হয় ধাপে ধাপে, কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত গণমাধ্যমের প্রচারের ঢক্কানিনাদের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি ধাপকে সংস্কারের একেকটি প্রজন্ম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আমাদের দেশেও বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের গোড়ায় নরসিম্হা রাও-মনমোহন সিং-এর হাত ধরে যখন নয়া উদারবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত, এই আড়াই দশক সময়কালে সংস্কার প্রক্রিয়া বেশ কয়েকটি ধাপ বা প্রজন্ম পেরিয়ে এসেছে। যেমন একেবারে শুরুর দিকে প্রথম প্রজন্মের সংস্কার প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নীকরণ। নব্বই দশকের একেবারে শেষপর্বে এবং একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় চালু হল দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার, যার কেন্দ্রে ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত নবরত্ন সংস্থার বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নীকরণ, ব্যাঙ্ক-বীমা প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারীকরণ এবং জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রগুলি থেকে রাষ্ট্রকে ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করে নেওয়া।

এই দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার পর্বেই আক্রমণ নেমে এল কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের অবসরকালীন আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ পেনশনের ওপর। ২২ ডিসেম্বর ২০০৩, কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন প্রথম এন ডি এ সরকার 'নয়া পেনশন প্রকল্প' কার্যকরী করার বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১ জানুয়ারি ২০০৪ বা তার পরে যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর সমূহে যুক্ত হবেন, তাঁরাই এই নয়া ব্যবস্থার আওতায় আসবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি প্রচলিত পেনশন ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালতের যে পর্যবেক্ষণ তার বিরোধী তো বটেই, এমনকি পেনশন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য গঠিত ভট্টাচার্য কমিটির সুপারিশেরও বিরোধী। ১৯৮২ সালে জনৈক ডি এস নাকারা কর্তৃক দাখিলীকৃত একটি রিট পিটিশনের শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল ঃ 'পেনশন শুধুমাত্র কর্মজীবনের ভূমিকার স্বীকৃতি নয়, এটি আর্থিক সুরক্ষা সমৃদ্ধ আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার যা বার্ধক্যে, যখন শারীরিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস পেতে থাকে, তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা বলয় সৃষ্টি করে। পেনশন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য গঠিত ভট্টাচার্য কমিটির সুপারিশ ছিল, 'কর্মজীবনের শেষ ৩৬ মাসে প্রাপ্ত গড় বেতনের অন্তত ৫০ শতাংশ বিধিবদ্ধ পেনশন নির্নয়ের মাপকাঠি হওয়া উচিত। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশকে কন্ট্রিবিউটরি পেনশনের আওতায় আনা যেতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশ মানেনি। নতুন পেনশন ব্যবস্থা চালু করার সপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র যুক্তি ছিল, পেনশনের দায়ভার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় কোষাগারের আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার কাজটা কঠিন হয়ে পড়ছে। কিন্তু এই যুক্তি অপযুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ২০০৪ ও তার পরবর্তী পর্বের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউটরি পেনশন চালু করার পাশাপাশি, ২০০৪-এর আগে নিযুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ পেনশন চালু থাকবে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রেও বিধিবদ্ধ বা ডিফাইন্ড পেনশন বেনিফিট চালু থাকে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে ডিফাইন্ড পেনশন প্রকল্পের যে দায়ভার তা বহন করার পাশাপাশি কন্ট্রিবিউটরি পেনশন স্কীমেও প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃক পদেয় অর্থের সম পরিমাণ অর্থ পেনশন ফাণ্ডে প্রদান করতে হবে। ফলত, আর্থিক দায়ভার হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পাবে। এই প্রবণতা জারি থাকবে আগামী প্রায় ৩৪ বছর। ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের অনুরোধে বেঙ্গালুরুর 'সেন্টার ফর সোশ্যাল এণ্ড ইকনমিক চেঞ্জ' একটি তথ্যানুসন্ধান করে। তারা জানায় ২০০৪-২০৩৮ এই ৩৪ বছরে পেনশনখাতে সরকারের দায়ভার বৃদ্ধি পাবে ১৪,২৮৪ কোটি টাকা থেকে ৫৭,০৮৮ কোটি টাকায়। স্বভাবতই সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ফিসক্যাল ব্যালেন্সের যে অজুহাত খাড়া করা হয়েছিল, তা যে ভিত্তিহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সর্বোপরি এই ধরনের একটি নতুন ব্যবস্থার আইনী রূপায়ণের আগে এন ডি এ অথবা ইউপিএ-১ সরকার কেউই শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা করেনি। যদিও ইউপিএ-১ সরকার যে জাতীয় ন্যূনতম কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, তাতে বলা হয়েছিল শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশ্নে বিরোধীতা অপেক্ষা আলোচনা, সহযোগীতা ও সহমতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সারাভারত ফেডারেশন এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের কনফেডারেশন ধারাবাহিকভাবে নয়া পেনশন প্রকল্পের বিরোধীতা করে আসছে। প্রতিবাদমূলক বিভিন্ন কর্মসূচীর পাশাপাশি, ৩০ অক্টোবর ২০০৭ একদিনের ধর্মঘটও প্রতিপালিত হয়। যে কারণগুলির জন্য এই দুটি সংগঠন যৌথভাবে এই নতুন পেনশন ব্যবস্থার বিরোধীতা করছে সেগুলি হল—(ক) এই প্রকল্প সরকারী কর্মচারীদের বৃটিশ আমল থেকে চালু থাকা সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করবে, (খ) এই প্রকল্প পেনশন ফাণ্ডে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ করে দেবে (গ) ফাটকা পুঁজির স্বার্থেই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে, কর্মচারী স্বার্থে নয়, (ঘ) এই প্রকল্প থেকে সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টি সম্পূর্ণতই শেয়ার মার্কেটের ওঠা-নামার ওপর নির্ভরশীল। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির দ্বিতীয় যে কুফলটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অভ্যন্তরে সংক্রমিত হচ্ছে, তা হল স্থায়ী ও নিয়মিত চরিত্রের সরকারী কাজে চুক্তিপ্রথায় অনিয়মিত পদ্ধতিতে নিয়োগ। ১৯৯১ সাল থেকেই এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে শুরু হলেও, সম্প্রতি এই প্রক্রিয়া মাত্রাতিরিক্ত গতি লাভ করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারী এবং বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী দপ্তরগুলিতে স্থায়ী কাজ বা পদে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মচারীরা ধীরে ধীরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে চলেছেন। এই বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারী এবং রাজ্য সরকারী দপ্তরগুলিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের এক-তৃতীয়াংশই অস্থায়ী বা চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত। এই অংশের কর্মচারী স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় দায়িত্ব প্রতিপালন করলেও, কাজের নিশ্চয়তা, সমবেতন বা অন্যান্য সুবিধা কিছুই পান না। অথচ প্রাক্ বিশ্বায়ন পর্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষয় ছিল, স্থায়ী কাজে স্থায়ী নিয়োগ। বিচার ব্যবস্থাও বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রকে প্রচলিত শ্রমআইন মান্য করার নির্দেশ দিয়েছে। যে শ্রমআইনের মর্মবস্তু হল স্থায়ী কাজে অস্থায়ী নিয়োগকে মান্যতা না দেওয়া। অবশ্য এই শ্রমআইন চালু হয়েছিল বিশ্বায়ন পর্বের আগে যখন রাষ্ট্র ছিল জনকল্যাণকামী।

এন এস এস ও প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশে কর্মে নিযুক্ত মানুষের তিন-চতুর্থাংশের কোন বিধিবদ্ধ চুক্তিপত্র নেই। এদের ৭০ শতাংশের নেই কোন সামাজিক সুরক্ষা। চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত ও অনিয়মিত কর্মচারীদের সংগঠিত হওয়ার ও দর কষাকষির অধিকার প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের যথোপযুক্ত সংশোধন করা প্রয়োজন। ঐ আইনে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন যাতে মূল নিয়োগকর্তা অথবা কনট্র্যাক্টর কোন ধরনের শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থবিরোধী অসাধু উপায় অবলম্বন করতে না পারেন।

২৬ অক্টোবর ২০১৬, সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে 'সমকাজে সমবেতন' সংক্রান্ত যে রায় প্রদান করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ ''আমাদের সুচিন্তিত মত হল, শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোন যান্ত্রিক মাপকাঠি নির্ধারণ ত্রুটিপূর্ণ। সম দায়িত্বসম্পন্ন কাজে কম বেতন দেওয়া কোনভাবেই যুক্তিপূর্ণ নয়।'' এই সমাবেশ মনে করে সরকারের মতন 'আদর্শ' নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রে চুক্তি প্রথায় নিয়োগ যুব সমাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। ৭ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সাথে সম্পৃক্ত শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসানে একটি আদর্শ বিধি চালু করার প্রস্তাব করেছে।

নয়া উদারবাদী অর্থনীতির এই দুটি বিষময় ফলের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম জারি রাখার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও রাজ্য কো-অর্ডিডেশন কমিটি অঙ্গীকারবদ্ধ। এই দুটি বিষয়কে সামনে রেখে গত ১০ জুন ২০১৭ এবং ২৮ আগস্ট ২০১৭ যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কনভেনশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আজকের অবস্থান সমাবেশ। এই সমাবেশ 'নয়া পেনশন' ব্যবস্থা বাতিল ও সমাকাজে সমবেতন প্রদান এই দুটি দাবিকে সামনে রেখে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন প্রয়োজনে ধর্মঘটে যাবার অঙ্গীকার গ্রহণ করছে। পাশাপাশি দেশব্যাপী সমগ্র নয়া উদারবাদী নীতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে সর্বশক্তি নিয়ে অংশগ্রহণের দায়বদ্ধতা সোচ্চারে ঘোষণা করছে। □

তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সাম্প্রতিক আন্দোলন

সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাজ্য সরকারী কর্মচারী শিক্ষকসহ বিভিন্ন অংশের কর্মচারীরা এক নজিরবিহীন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে দাবি অর্জনে সাফল্যলাভ করলেন। এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, কর্মচারীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কোনো সন্দেহ নেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রামই শুধু নয়, খামখেয়ালী স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত মানুষের আন্দোলনকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করবে।

গত ৬-৮ জানুয়ারি '১৭ তামিলনাড়ু গভ. এম. এসো (TNGEA) তাদের দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ৬দফা দাবিতে যেমন (১) ৮-ম বেতন কমিশন গঠন এবং কর্মচারী সংগঠনের সাথে আলোচনা করে বেতন কমিশনের সুপারিশ ০১.০১.১৬তে সংশোধন করে কার্যকরী করা (২) ০১.০১.২০১৬ থেকে ২০% অন্তবর্তীকালীন রিলিফ প্রদান (৩) নতুন পেনশন স্কীম (NPS) বাতিল এবং সকলের জন্য বিধিবদ্ধ পেনশন স্কীম চালু করা (৪) চুক্তিপ্রথায়, ক্যাজুয়াল, আউট সোর্সিং ইত্যাদি বাতিল করে শূণ্যপদসমূহ নিয়মিতভাবে পূরণ করে টাইম স্কেলে বেতন প্রদান ইত্যাদি, অন্যথায় ২৫ এপ্রিল, ২০১৭ থেকে অনির্দিষ্টকালীন ধরে ধর্মঘটে যাবেন। এই ধর্মঘটকে ঘিরে সারা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রচার ও প্রস্তুতি তুঙ্গে উঠে। ধর্মঘটের প্রাক্কালে রাজ্যের প্রবীণ শিক্ষামন্ত্রী নেতৃবৃন্দকে ফোন করে মন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের সাথে মীমাংসার কথা বলতে বলেন। মুখ্যসচিবের সাথে কথা বলতে গেলে তিনি ধর্মঘটকে চ্যালেঞ্জ জানান এবং কথা বলতে অস্বীকার করেন। মুখ্যসচিবের এই আচরণ কর্মচারীদের স্তম্ভিত করে দেয় এবং ধর্মঘটে যেতে বাধ্য করা হয়। ধর্মঘট ব্যাপক সাড়া দেবে সরকারপক্ষ আলোচনায় ডাকেন এবং সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় ৩ মাসের মধ্যে (৩০ জুন '১৭) বেতন সংশোধন কার্যকরী হবে। কিন্তু বেতন সংশোধনী কমিটির সুপারিশ জমা দেওয়ার মেয়াদ আরো ৩ মাস বাড়ানো হয়। এই পরিস্থিতিতে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে শিক্ষকদের সাথে নিয়ে তৈরি হয় জ্যাকটো-জে ই ও সংগঠন (JACTTO-GEO-Joint Action Committee of Tamil Nadu Teachers & Govt. Employees Organisation)। জয়েন্ট এ্যাকশান কমিটি গড়ে ওঠার পর প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী সম্পন্ন করে ২২ আগস্ট, ২০১৭ একদিনের ধর্মঘট আহুত হয়। সরকারের "No work No pay" নির্দেশকে উপেক্ষা করে ধর্মঘট চূড়ান্তভাবে সাফল্যলাভ করে। জয়েন্ট এ্যাকশান কমিটি এরপর ৭ সেপ্টেম্বর '১৭ থেকে অনির্দিষ্টকালব্যাপী ধর্মঘট ঘোষণা করে। সরকার প্রমাদ গোনে। কর্মচারী-শিক্ষক ঐক্য ভাঙার জন্য তৎপরতা চালায়। কিন্তু JACTTO-GEO-র সাংগঠনিক নেতৃত্ব বিশেষত TNGEO-র নেতৃত্ব ধর্মঘটে অটল থাকেন। ইতোমধ্যে সরকারের মদতে এক আইনজীবী ধম;ঘট বে-আইনী ঘোষণা করার দাবিতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি পি আই এল (Public Interest Litigation) নথিভুক্ত করে। ৭ সেপ্টেম্বর '১৭-র ধর্মঘট সারারাজ্যে দারুণ সাড়া ফেলে দেয়। ঐদিন হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থে মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্টকে উদ্ধৃত করে (২০০৩ সালে সেই ঘটনা—পাঠক মনে করুন) ধর্মঘটের উপর স্থগিতাদেশ জারী করে। (মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চে)। কিন্তু ধর্মঘট নতুন শক্তি অর্জন করে। সমস্ত ভয় ভীতি উপেক্ষা করে বহু বিভাগীয় সংগঠন ধর্মঘটের সপক্ষে এগিয়ে আসে। এমনকি বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা ১২ সেপ্টেম্বর ১৭র পর ধর্মঘটে যোগ দেয়।

সরকারের মদতে ঐ আইনজীবী আদালত-অবমাননার মামলা দায়ের করে TNGEA-র রাজ্য সভাপতিকে পার্টি করেন। মামলা ১৫ সেপ্টেম্বর '১৭ শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট হয়। ধর্মঘটী কর্মচারী শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৫ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক হয় মামলা শুনানীর দিন পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর কর্মচারীরা ধর্মঘটে শামিল আর JACTTO-GEO-র নেতৃবৃন্দ হাইকোর্টে উপস্থিত। হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন রায় উদ্ধৃত করে বে-আইনী ঘোষণা করা, নেতৃবৃন্দকে জেলে পাঠানো এবং সমস্ত কর্মচারীদের একঘণ্টার মধ্যে বরখাস্ত করার হুঁশিয়ারী দেন। কিন্তু অনমনীয় নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের আইনজীবী সরকারের অনড় এবং উপেক্ষার মনোভাব এবং বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ইতিহাস আদালতে বলতে থাকেন এবং ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন এবং আলোচনাপূর্বক মীমাংসার দাবি জানাতে থাকেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ ধর্মঘট অবিলম্বে প্রত্যাহার করার নির্দেশ জানালে কর্মচারী-নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখান করেন এবং সুষ্ঠু মীমাংসার দাবি জানান। খানিক বিরতির পর হাইকোর্ট দাবির মীমাংসায় মধ্যস্থতা করতে রাজী হয় এবং ধর্মঘট আপাতত প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানায়। হাইকোর্ট ২২ সেপ্টেম্বর '১৭ মুখ্য সচিবকে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। ২২ সেপ্টেম্বর '১৭ মুখ্যসচিবকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। ২২ সেপ্টেম্বর '১৭ মুখ্যসচিব এ্যাডভোকেট জেনারেলকে নিয়ে হাইকোর্টে হাজির হন এবং বেতন সংশোধনের জন্য ৫ মাস সময় চান কিন্তু হাইকোর্ট জানান সরকারকে ১৩ অক্টোবর '১৭-র মধ্যে বেতন কমিশন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর '১৭-র মধ্যে বেতন কমিশন এবং রিপোর্ট চেয়ে নিতে হবে। সরকার ব্যর্থ হলে পরের শুনানীর দিন ২২ অক্টোবর '১৭ হাইকোর্ট অন্তবর্তীকালীন রিলিফ ঘোষণা করবে। এরপর দ্রুত ঘটনা ঘটতে থাকে। সরকার ২৯ সেপ্টেম্বর '১৭ বেতন-কমিশনের রিপোর্ট পান এবং ১৩ অক্টোবর বেতন সংশোধনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

নতুন পেনশন স্কীম বাতিল সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট ৩০ নভেম্বর '১৭ জমা পড়ার কথা। হাইকোর্ট মামলাটির নিষ্পত্তি ঘোষণা করেনি। এই ঘটনা JACTTO-GEO নেতৃবৃন্দের অপরাজেয় মনোবল, দুর্দমনীয় সাহস এবং সীমাহীন দৃঢ়তা আর প্রত্যয়ের নিদর্শন। তামিলনাড়ুর কর্মচারী শিক্ষক সমাজ সৃষ্টি করলেন সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক সাফল্য।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০৩ সালের সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের পরে (যেখানে প্রয়াত জয়ললিতার সরকার কলমের এক খোঁচায়, ১,৭২,৭১৩ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছিলেন আর যে আন্দোলন তুলে এনেছিল আমাদের প্রিয় প্রয়াত নেতা কম. আর মথু সুন্দরমকে) তামিলনাড়ুর বাহাদুর কর্মচারী সমাজ ২০ দফা দাবিতে ১১ দিনের ধর্মঘট করেছেন (১০ ফেব্রুয়ারি '১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি '১৬) এবং অনেকগুলি দাবি অর্জন করেছেন এবং সরকারকে বাধ্য করেছেন New Pension Scheme বাতিল করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে। প্রচণ্ড দমনপীড়ণ আর ভয়ংকর স্বৈরাচারী আক্রমণের মধ্যে থাকা পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজের কাছে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করতে পারে তামিলনাড়ুর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই আন্দোলন। □

মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ ও নারী সমাজ

অশোক পাত্র
কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রুশ দেশে শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মার্কসবাদী তত্ত্বের সাথে লেনিনীয় তত্ত্বের প্রয়োগের দ্বারা দুনিয়া কাঁপানো মাত্র দশ দিনে যে মহাবিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল বিশ্ব ইতিহাসে সেই যুগান্তকারী ঘটনাই ''মহান নভেম্বর বিপ্লব'' হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমান বছরটি অর্থাৎ ২০১৭ সালটিতে সারা পৃথিবীর ন্যায় আমাদের দেশেও নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়েছে। মানব সভ্যতার হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম ঘটনা হলো এই নভেম্বর বিপ্লব। কারণ আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা থেকে দাস ব্যবস্থা—তারপর সামন্তবাদী ব্যবস্থা সেখান থেকে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বুর্জোয়া ব্যবস্থা, তারপর নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে শ্রেণী শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হলো তা এক কথায় অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন। বৈপ্লবিক তাৎপর্যের দিক থেকে বিচার করলে এর আগেএকটি ব্যবস্থা থেকে আরেকটি ব্যবস্থায় উত্তরণ যখন ঘটেছে তখন ক্রমান্বয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ আরো বেশি বেশি করে শ্রেণী শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে, গৃহবন্দী পশুর মতো নিষ্পেশিত হয়েছে শোষক শ্রেণীগুলির দ্বারা। তারা কখনো দাস মালিক, কখনো রাজা, কখনো জমিদার, কখনো যাজক বা পুরোহিত, কখনো কারখানার মালিক পুঁজিপতি বা ধনিক শ্রেণী---যারা শ্রমজীবীদের রক্ত শোষণ করে সম্পদের পাহাড় তৈরি করে চলেছে। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যবস্থার অবসানে এক শ্রেণীকে সরিয়ে আরেক শ্রেণী এসেছে আরো বেশি করে শোষণের লক্ষ্যে। আর নভেম্বর বিপ্লবের ফলে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো। এই মহান বিপ্লব একদিকে যেমন রুশ দেশে শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটিয়ে সর্বহারাদের রাজ কায়েম করলো---অন্যদিকে তেমনি পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমজীবি মানুষের কাছে নতুন আদর্শের বার্তা নিয়ে এল এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নিগড় থেকে পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন অবিস্মরণীয় প্রেরণা যোগালো, তেমনি এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ সারা পৃথিবীতে এই বিপ্লব পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পাশাপাশি গণতন্ত্র রক্ষা এবং বর্ণবিদ্বেষবাদ, জাতিবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও নতুন প্রেরণা নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করলো। শুধু তাই নয় এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীব্যাপী যে বিপুল প্রভাব তার দ্বারা দেশে দেশে গড়ে উঠতে থাকলো কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র যুব মহিলাদের সংগঠনগুলি। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বা বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণী ও সামন্ততন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিও বাধ্য হলো শ্রমিকদের কল্যান সাধন-বেকারী মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রযন্ত্রের আংশিক হস্তক্ষেপ ঘটাতে। স্বাস্থ্য, শিক্ষার অধিকার খাদ্যের নিরাপত্তা এক কথায় বর্তমান বিশ্বে যে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাও সম্ভব হয়েছিল মহান নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবেই। শ্রমিক কৃষকের ন্যায্য মজুরী, নারী ও সংখ্যালঘুসহ শ্রমিক কৃষক পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের কল্যাণের জন্য বর্তমানে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বা তথাকথিত আমাদের দেশের মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে গণতন্ত্রেও যত টুকু কনশেসন শ্রমজীবীরা আজ পাচ্ছেন তাও নভেম্বর বিপ্লবেরই অবদান।

এই বিপ্লব প্রেরণা হিবে কাজ করেছিল চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, কোরীয় বিপ্লবে। আকর্ষণ করেছিল রবীন্দ্রনাথ, রমা রঁলা, বার্ট্রান্ড রাসেলসহ সমসাময়িক ও তার পরবর্তী তাবৎ বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র শিল্পী প্রমুখদের। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছিলেন রাশিয়ায় না এলে তাঁর তীর্থ দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এখানে ধর্মগরিমার ইতরতা দেখিনি।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে ইউরোপ মহাদেশের ফ্রান্সে সংগঠিত 'ফরাসী বিপ্লব' ও এ বিশ্ব ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেই বিপ্লব ছিল সামন্ত বাদী স্বৈরাচার-অত্যাচার-শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে। ঐ বিপ্লবে জার সম্রাটদের স্বৈরশাসনের প্রতীক 'বাস্তিল' দুর্গের পতন ঘটেছিল। ফরাসী বিপ্লব থেকে মন্দ্রিত হয়েছিল স্বাধীনতা, সাম্য মৈত্রীর বানী যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবে মানব সভ্যতার যারা মেরুদণ্ড বা পিলসুঞ্জ সেই সর্বহারা শ্রেণীর শোষণের অবসান ঘটেনি। এই বিপ্লব সংগঠনে যেমন প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভলটেয়ার, রুশো প্রমুখ বিশিষ্ট দার্শনিকদের এবং সমগ্র ইউরোপের তৎকালীন প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদসহ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৭৭৬-১৭৮৩) অংশগ্রহণকারী ফেরত সেনা প্রধান প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বা ভূমিকা ছিল। তেমনি রাশিয়ায় 'রুশ বিপ্লব' বা মহান নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, ১৯৯৯ সালে বি.বি.সি কর্তৃক বিগত সহস্রাব্দের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে জনমতের বিচারে যে মহান দার্শনিক বিবেচিত হয়েছিলেন সেই 'কার্ল মার্কসের' কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে সংজ্ঞায়িত তত্ত্বকে লেনিনীয় তত্ত্বের দ্বারা। আরো সমৃদ্ধতর করে রুশ দেশের মাটিতে বাস্তবে প্রয়োগের দ্বারা, কেননা লেনিন এই বিপ্লবে প্রমাণ করেছিলেন মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্র কোন আপ্তবাক্য নয়—এটি বিজ্ঞান এবং মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী এই সমাজ বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব।

এই বিপ্লব এক ধাক্কায় সারা পৃথিবীকে যেভাবে চমকিত করেছিল তেমনি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল সারা দুনিয়ার শোষিত-বঞ্চিত, অত্যাচারিত লাঞ্ছিত, শাসিত, অবমানিত খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী মানুষকে। বিপ্লবের বিজয়ের আগে 'অরোরা' নামক জাহাজ থেকে জারের শীত প্রাসাদ লক্ষ্য করে যে কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, ১৯৪৯ সালে মহান চীন বিপ্লবের রূপকার মাও-জে-দঙ সে সম্পর্কে বলেছিলেন ''অরোরা জাহাজের কামানের গোলা আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছিল''। যুগপৎ ঘুম ভাঙিয়েছিল সারা দুনিয়ার শ্রমজীবীদের। দেশে দেশে জন্ম নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্দীপিত শ্রমজীবীদের সুসংগঠিত সংগঠনগুলির। আমরা সবাই জানি যে, মার্কসই বলেছিলেন ''এতদিন দার্শনিকেরা পৃথিবীকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এখন দরকার একে পাল্টে ফেলার''। আমাদের এই আলোচনার প্রতিপাদ্য যেহেতু ''নভেম্বর বিপ্লব ও নারী সমাজ'' অর্থাৎ নারীর অধিকার—স্বাধীনতা, তাদের ক্ষমতায়ন, তাদের উপর যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে ও সর্বোপরি নারী মুক্তির ক্ষেত্রে মহান নভেম্বর বিপ্লব যে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই বিষয়, সেজন্য মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ যা নভেম্বর বিপ্লবের ভিত্তিভূমি সে সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-এক কথা আলোচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মার্কসবাদ কোনো আপ্ত বাক্য নয়—এটি শ্রেণী শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার একটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। আর এই মতবাদ হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়েনি, বা শূন্য থেকে এর শুরু নয়।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭-১৮

প্রভাত পট্টনায়েক
অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য

প্রবাদ বাক্যের বাঘের পিঠে চরা মানুষটির মতই, ভারতী অর্থনীতিক বর্তমান সময়ে এক অনিশ্চিত সফরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকারের ২০১৭-১৮ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে, যদিও এর দাওয়াই হিসেবে নিশ্চুপ থেকে সফর চালিয়ে যাওয়ার কথাই বলা হচ্ছে।

সমস্টিক অর্থনীতির (ম্যাক্রোইকনমিক) যে পরিসখ্যান এই আর্থিক সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার কর্তৃক দাভোস বৈঠক জন্য প্রস্তুত করা 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক আপডেট'-এর তথ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং ভারত সরকারের নিজস্ব কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্যের সাথে এর সাযুজ্য কম। বর্তমান আর্থিক বছরে এর মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্য হার বলা হয়েছে ৫৬.৭৫ শতাংশ (আই এম এফের তথ্যের যা রয়েছে ৬.৭ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানের তথ্যে ৬.৫ শতাংশ) এবং যদি কোন অনাকাঙ্খিত বিষয় না ঘটে, অর্থাৎ যদি বর্তমান বিপজ্জনক সওয়ারি চলতেই থাকে। তাহলে ২০১৮-১৯ সালে জি ডি পি-র প্রত্যাশিত বৃদ্ধির হার হবে ৭-৭.৫ শতাংশ (আইএমএফ-র ঘোষণা অনুযায়ী যা ৭.৪ শতাংশ)।

পূর্বানুমান হল, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, যদি না মোদী গোটা নোট বাতিলের মতন কোন ভেল্কি দেখান (আই এম এফ সমীক্ষা সঠিকভাবেই এবং বিচক্ষণতার সাথে যার সমালোচনা করেছে)। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো, এ দেশের অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে (বেসরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে) গতি সৃষ্টি করবে। যদি না সাম্প্রতিক অনিশ্চিত উপাদানগুলি এলো-মেলো হয়ে যায়। দুটি সম্ভাব্য সমস্যার কারণ হিসেবে সমীক্ষায় যা উল্লিখিত হয়েছে, তা হল, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের আরও মূল্য-বৃদ্ধি এবং দেশের শেয়ার বাজারে আরও ধস্ নামা। তেলের কম দাম এবং শেয়ার বাজারের তেজীভাব যুগ্মভাবে চালু সুদের হারে আর্থিক ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করেছে। বিশেষত, দ্বিতীয়টি উল্লেখযোগ্য বিদেশী লগ্নী পুঁজির আগমণকে সুনিশ্চিত করেছে, যা বিদেশী মুদ্রায় সঞ্চয়কে বর্তমান বিনিময় হারের সপক্ষে যথেষ্ট পরিমান পুষ্ট করেছে।

সমীক্ষা তাই অর্থনীতির বর্তমান বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে স্টক মার্কেটে সৃষ্ট বুদবুদের ভূমিকাকে খোলাখুলি স্বীকার করেছে। এই বুদবুদ ফেটে গেলে, পুঁজির বহির্গমন ঘটবে, যাকে ঠেকানোর জন্য সুদের হার বৃদ্ধি করতে হবে। যা অর্থনীতিকে মন্দার দিকে ঠেলে দেবে। সমীক্ষার খোলাখুলি দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাযুজ্য রেখে। অর্থনীতিকে বর্তমান উদ্ভট অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়নি। যদিও সরকার কর্তৃক প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত কিভাবে অর্থনীতিকে বর্তমান পরিস্থিতির বক্সীদশা থেকে মুক্ত করা যায়। যেমন সমীক্ষার স্বীকারোক্তি, যে শেয়ার বাজারে ধস্ নামলে, অর্থনীতি সমস্যায় পারবে এর পাশাপাশি এমন ধারনায় অনুবর্তী হওয়া উচিত হবে না যে শেয়ার বাজারে তেজীভাব দীর্ঘকাল বজায় থাকবে। বরং এমন কোন পথ খুঁজে বের করা উচিত যাতে শেয়ার বাজারের বুদবুদের ওপর নির্ভরশীলতা কমে। কিন্তু না তেমন কোন পথের অনুসন্ধান অর্থনৈতিক সমীক্ষায় করা হয় নি।

সমীক্ষার এই দিশাহীনতা যথেষ্ট বিরক্তিকর। কারণ ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির বর্তমান হার শুধুমাত্র সমীক্ষায় উল্লিখিত দুটি বিষয়ের ওপরেই নির্ভর করছে না। বরং আরও বেশ কয়েকটি উপাদান রয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি হল মার্কিন যুদ্ধের হার। মার্কিন ফেডারেশন রিজার্ভ বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান জেনেও ইয়েসেনের কার্যকালের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প রাজি হন নি (এমন ঘটনা ঐ দেশে প্রথম ঘটল) এবং তাঁর উত্তরসূরী জেরম পোয়েল, বাহ্যিক দিক থেকে ইয়েলেনের নীতির অনুসারী হলেও, রিপাবলিকানদের চাপে সুদের হার বৃদ্ধির দিকে ঝুকতেও পারেন। এমনকি ইয়েলেনও এই প্রস্তাব নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিলেন। সুতরাং তাঁর উত্তরসূরী আজ অথবা কাল একে কার্যকরী করতেই পারেন। সেক্ষেত্রে পুঁজি ভারতের মতন দেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেবে, ঠিক যেমনটা ঘটতে পারে দেশের শেয়ার বাজারে ধস নামলে এবং পুঁজি দেশান্তরী হলেও ধস নামবে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়া হবে যা সমীক্ষায় আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় যে অতিরিক্ত বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়া উচিত তা হল ইরানের প্রতি ট্রাম্পের যুদ্ধের হুংকার। তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে এবং অপরিশোধিত তেলের ব্যারেল পিছু দাম পৌঁছেছে ৭০ ডলারে। এখনি এই প্রবণতার বিপরীতমুখী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত তেলের পরিমাণ হ্রাস পাবার পর এবং শেল তেলের উৎপাদন, আন্তর্জাতিক তেলের দামের পড়তির কারণে হ্রাস পাবার পর, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া খুব ধীর লয়ে ঘটছে, যা অপরিশোধিত তেলের দাম আরও বৃদ্ধির পূর্বলক্ষণ। এখন ট্রাম্প যদি ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেন, তাহলে তেলের দাম হু হু করে বাড়বে এক ভারতীয় অর্থনীতির মুদ্রাস্ফীতি, বাণিজ্য ঘাটতি ও বৃদ্ধির হারের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

তৃতীয়ত, রপ্তানি বৃদ্ধি ভারতীয় অর্থনীতিকে ধারাবাহিক উদ্দীপনা যোগাবে এই প্রত্যাশা নিম্নলিখিত দুটি উপাদানের যেকোন একটি বা উভয়ের কারণেই অচিরে বিলীন হয়ে যেতে পারে। উপাদান দুটির একটি হল বিশ্ব-অর্থনীতির বৃদ্ধির হার, তেলের দাম বৃদ্ধি ও মার্কিন সুদের হার বৃদ্ধির কারণে নিম্নগামী হওয়ার সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ধিত সংরক্ষণবাদ যা ভারতের পরিষেবা রপ্তানির সুযোগকে সঙ্কুচিত করবে। বিশ্ব অর্থনীতি কিছুটা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বলে বলা হলেও আমাদের দেশে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে, যা ভারতীয় অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং যা আগামী দিনগুলিতে আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এখন এটাও পরিস্কার নয় যে চীন, যার বৃদ্ধির হার আরও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে, এই হ্রাসের প্রবণতাকে এত সহজভাবে গ্রহণ করছে কেন, তবে ভারতের মতন দেশের বাজার দখলের জন্য যে তারা বিশেষ উদ্যোগ নেবে তা নিশ্চিত এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর দাভোসে ঘোষণা—'সংরক্ষণবাদ সন্ত্রাসবাদের মতই ক্ষতিকর', থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ভারতে উৎপাদিত পণ্যের বাজার, বাণিজ্য ঘাটতি ইত্যাদিকে অবাধ আমদানির ধাক্কা থেকে রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। অর্থনীতির সামনে উপরোক্ত সমস্ত বিপদগুলির প্রেক্ষিতে, সমীক্ষার মনোভাব হল সম্পূর্ণ নীরবতা পালন। বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, লিঙ্গ সাম্য। বিজ্ঞানের জন্য খরচ যেদিও এই সমস্ত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সংস্থান কিভাবে হবে, তার কোন স্পষ্ট আভাস নেই। ইত্যাদি প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হলেও, অর্থনীতি সম্ভাব্য বিপদগুলি কিভাবে মোকাবিলা করবে বা অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য কি ধরনের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে সমীক্ষায় কার্যত কিছুই বলা হয়নি।

এই বিষয়ে চীনের পরিকল্পনা ভারতের থেকে কয়েক কদম এগিয়ে। বিশ্ব অর্থনীতির সংকটের প্রেক্ষিতে চীনের বলিষ্ট ভাবনা হল, এ যাবৎকালে অনুসৃত রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতির তুলনায় অভ্যন্তরীন বাজারকে শক্তিশালী করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য, বিশ্ব সংকটের প্রেক্ষিতে বিপুল আর্থিক প্রনোদশা সৃষ্টির পাশাপাশি, সরকারী সিদ্ধান্তে দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষত উপকূলবর্তী এলাকায় মজুরির হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই মজুরির হার বৃদ্ধির ফলে একদিকে চীনের রপ্তানি বাণিজ্যে মার খাওয়ার আশংকা থাকলেও, অন্যদিকে সে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে শক্তিশালী করবে। প্রকৃত প্রস্তাবে বেশ কিছু দিন ধরেই চীনের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিময় হার বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যা থেকে চীনের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র পরিবর্তনের প্রবণতা স্পষ্ট হয়।

চীন তার রপ্তানি নির্ভরতা কমিয়ে, অর্থনীতির বৃদ্ধির ভিত্তিকে অভ্যন্তরীন বাজারের ওপর নির্ভরশীল করতে পারবে কিনা তা এখনও অনির্দিষ্ট। কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষার অর্থবহ নীরবতা প্রমাণ করে, এ দেশের সরকারী পর্যায়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে কোন আলোচনাই শুরু হয়নি। বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক অজ্ঞতা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তারা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অমনোযোগী, কিন্তু সমীক্ষায় অন্তত কিছু ইঙ্গিত থাকা প্রয়োজন ছিল যা নেই।

কার্যত একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সমীক্ষা মধ্যবর্তী পর্যায়ের কিছু পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। যেখানে একটি কৌতুহলী প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যা হল কৃষকদের প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রদান ও নগদ হস্তান্তরকে কৃষি সরঞ্জামে ভর্তুকি ও ফসলের সহায়ক মূল্য প্রদানের বিকল্প হিসেবে চালু করা। সহায়ক মূল্যের পরিবর্তে নগদ হস্তান্তর চালু করার যে দাবি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠকে উন্নত দেশগুলি উত্থাপন করেছে, তারই সমর্থন যেন পাওয়া যাচ্ছে এই অর্থনৈতিক সমীক্ষায়, যা ভারত সরকারের একটি দলিল। যদিও ভারত সরকার ধারাবাহিকভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে।

এর থেকে অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কেই প্রশ্ন ওঠে। এটা কি প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও আইএমএফ-র মতন প্রতিষ্ঠানের (যেখানে তিনি বেশ কিছুদিন যুক্ত ছিলেন) এবং যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে গঠন করেছে, ব্যক্তিগত মতামত? না কি এটি সরকারেরই অবস্থান? অর্থনৈতিক সমীক্ষা যে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বয়ম্ভর হয়েছে, তার প্রমাণ হল, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয়কে দ্বিগুণ করার সরকারী ঘোষণাকে প্রশংসা করা হলেও, এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য কোন পরিকল্পনার কথা সমীক্ষায় নেই। □

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে চাই নিরন্তর সংগ্রাম

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
যুগ্ম-সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

শ্রেণি বিভক্ত সমাজে সমাজ উত্তরণের কালপর্বে আন্দোলন সংগ্রামে কর্মচারী সমাজের ভূমিকা বারে বারে প্রমাণিত। যদিও, সরকারী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠার শুরু থেকে দেশি-বিদেশি উভয় শাসকের অধীনে কর্মরত কর্মচারী হিসেবে রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন সময় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়বিধ ভূমিকা সকলেরই জানা। দেশি-বিদেশি শাসক বা রাজ অনুগ্রহের সুবিধা ভোগ, আবার বিপরীত মেরুতে অবস্থান গ্রহণের জন্য রাজরোষের মুখোমুখি হয়েছেন কর্মচারীরা। যতদিন রাজন্যবর্গ বা প্রশাসকের স্বার্থরক্ষা হয়েছে, ততদিন রাজকর্মচারীকে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন স্বার্থ ফুরিয়েছে বা স্বার্থের বিঘ্ন ঘটেছে কর্মচারীকে আক্রমণ করা হয়েছে—এমন বহু ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের বহু কর্মচারীর জীবনেও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও ঘটে চলেছে। কিছু অংশের কর্মচারী নানান বিভ্রান্তিকর উপাদানের সম্মুখীন হয়ে নিজের অবস্থান স্থির করতে দ্বিধাগ্রস্থ। উল্টোদিকে আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে অধিকাংশ শ্রমিক-কর্মচারী লড়াই জারি রেখেছেন।

দেশের শ্রমজীবী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ, আবার সমাজ দর্শনের অমোঘ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেতনায়, তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলেছে সংগঠনের প্রতিটি কাঠামোর মধ্য থেকে। সরকারী কর্মচারীদের উপর শোষণ, বঞ্চনা, দমন-পীড়নের শ্বাসরোধকারী পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন হয় যৌথ আন্দোলনের। গঠিত হয় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটি যৌথ মঞ্চ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সেই যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে কর্মচারীরা প্রাপ্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এবং নিজ আত্মসম্মান-আত্মমর্যাদা তুলে ধরার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে তোলে, যার ধারাবাহিকতা এখনও বর্তমান।

এই ধারাবাহিক সংগ্রাম-আন্দোলন শুধুমাত্র আর্থিক দাবি-দাওয়া আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আর্থিক দাবিতে সংগ্রামের মধ্যেই সাধারণ মানুষের সাথে কর্মচারীদের আন্দোলনের মেলবন্ধন ঘটে যায়, ফলে কর্মচারী সমাজের মধ্যে শ্রেণি চেতনার সূত্রপাত ঘটে। ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রাথমিক চেতনাকে গণতান্ত্রিক চেতনা সর্বোপরি অধিকারবোধ চেতনায় উন্নীত করা যায়।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য সংগঠিত-অসংগঠিত অংশের শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ের ক্ষেত্র আলাদা কিন্তু অভিমুখ অভিন্ন। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই আন্দোলনে বিভ্রান্তির বীজ বপন করতে, তাদের খণ্ড খণ্ড রূপ দিতে প্রতিপক্ষের প্রয়াসের বাইরে নয় কর্মচারী সমাজও। ৬০-৭০ দশকের আন্দোলনকেও অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আক্রমণের বহুমাত্রিকতার মধ্য দিয়ে পথ পরিক্রমা চলছে। আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে পুঁজিবাদ বেপরোয়া। ফলে লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে আর্জিত অধিকার হরণ করে মুনাফাকে স্ফীত করছে। আরও মুনাফার লোভে রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকাকে খর্ব করা হচ্ছে। নিয়মিত সংগঠিত অংশের পরিবর্তে চুক্তি-এজেন্সী আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে কাজ চলছে। একতরফাভাবে শ্রম আইন সংশোধন লঙ্ঘন করে চলেছে।

এর বিরুদ্ধে যাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধে সোচ্চারিত হওয়ার কথা তাদের একটা অংশ (সংখ্যায় কম হলেও) সাময়িক বিভ্রান্তিতে বিশ্বায়িত ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ শ্রেণি অবস্থানকে ভুলে গিয়ে সমঝোতা করতেই অভ্যস্ত। একদিকে উগ্র দক্ষিণপন্থী উগ্রজাতীয়াতাবাদ উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা জনমোহিনী শ্লোগান দিয়ে নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আবার, প্রচারের মুখোশে মুখ ঢেকে উন্নয়নের মেকি তত্ত্ব তৈরি করে বেড়াচ্ছে। অথচ মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়া আক্রান্ত দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের একাংশ প্রকৃত বিকল্প না পেয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। একদিকে তথাকথিত উন্নয়নতত্ত্বের পাশাপাশি নিচের স্তরে প্রতিনিয়ত হিংস্রতার প্রকাশ পাচ্ছে। আবার উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা শক্তি বৃদ্ধি করতে সবরকম সহায়তা পাচ্ছে। স্বভাবতই শ্রমজীবীদের আন্দোলন মুখরিত সংহতি আজ আক্রান্ত। কিন্তু আন্দোলন-সংগ্রামের বাস্তবতা হারিয়ে যায় নি। বরং অনেক বেশি সম্ভাবনা প্রতিদিন বিকশিত হচ্ছে। বিকশিত হচ্ছে লড়াই-আন্দোলনের নতুন নতুন ক্ষেত্র। যে কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক শোষণের জ্বালে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যাই একমাত্র পথ হিসেবে মনস্থির করেছিল, তারা আজ প্রতিরোধের রাস্তাকেই একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। রাজ্যের প্রায় সমস্ত অংশের শ্রমিক- কৃষক- ছাত্র- যুব- মহিলারা নিজস্ব দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে শামিল।

কর্মচারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনা চূড়ান্ত জায়গায় চলে গেছে। শুধু আর্থিক বঞ্চনাই নয়। আর্থিক প্রবঞ্চনার সাথে সাথে সমগ্র কর্মচারী সমাজের অধিকার ও মর্যাদার উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ করা ছাড়াও দলীয় ও অনৈতিক আর্থিক স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে খেয়ালখুশিমতো বেপরোয়াভাবে আংশিক ও অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। এক দপ্তরের সাথে অন্য দপ্তরকে যুক্ত করে দপ্তরের সংখ্যা কমিয়ে আনা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পিএসসি'র মাধ্যমে নিয়োগের যে প্রথা এতাবৎকাল বজায়ছিল, দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ও রাজনৈতিক স্বার্থে তাকেও পঙ্গু করা হচ্ছে। আবার, শুধু আর্থিক বা অধিকারগত বঞ্চনাই নয়, কর্মচারীদের প্রতি সরকারের তীব্র অপমানজনক মনোভাবের প্রতিফলন বারে বারে প্রকাশিত হচ্ছে। ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করলে 'ডায়েস-নন' বা বেতন কাটা হচ্ছে, অথচ কারণে-অকারণে ছুটি দিয়ে কর্মচারীদের সচেতন ঐক্যের বিপরীতে ধর্মীয় অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। পাশাপাশি কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে গড়ে ওঠা সংগ্রামকে রুখতে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকছে না। প্রশাসনিক আক্রমণের পরিণতিতে কর্মচারীকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। সংগঠন দপ্তরে আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভেঙে ফেলা, প্রতিহিংসামূলক বদলী ইত্যাদি আক্রমণ চলছে। কর্মচারীদের চাকরি জীবনে ছুটির সুযোগ সুবিধাকে উপেক্ষা করে নিজস্ব পাওনা ছুটি নেওয়ার ক্ষেত্রেও চলছে চরম অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে প্রশাসনে চিঠি দিলে উত্তর দেওয়া দূরে থাক, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরাসরি তা অগ্রাহ্য করে সংগঠনগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

রোহিঙ্গা সমস্যা প্রসঙ্গে

মানস কুমার বড়ুয়া

মায়ানমার নিবাসি বৃহৎ জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা। মায়ানমারে তাদের উপর নির্মম দমনপীড়ণ চলছে। চলছে নির্বিচার হত্যালীলা। বাধ্য হয়ে রোহিঙ্গারা সেই দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত, বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে। দেশান্তর হতে গিয়ে পথে প্রাণ হারাচ্ছেন শিশুসহ বহু রোহিঙ্গা। যে দেশে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই পেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন সেখানেও জুটছে অবহেলা ও আত্মমর্যাদাহীন জীবন। মায়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যা দীর্ঘদিনের। এর ঐতিহাসিক নানা কারণও আছে। সেই আলোচনায় ঢোকার আগে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উদ্ভব ও বিকাশ প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

রোহিঙ্গা কারা?

রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ নানামত প্রকাশ করেছেন। কারো মতে, রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তি রাখাইন শব্দ থেকে। রাখাইন শব্দটি থেকেই পরবর্তীকালে রোয়াং ও রোহিঙ্গা শব্দটি এসেছে। রোয়াং তিব্বতি শব্দ, যার অর্থ আরাকান। প্রাচীনকালে আরাকানা এলাকার মানুষ তাদের জন্মভূমিকে 'রক্ষইঙ্গ' নামে অভিহিত করত। এর অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস। তারা তাদের জন্মভূমিকে ''রক্ষইঙ্গ তঙ্গী'' বা ''রাক্ষসভূমি'' নামে পরিচয় দিতে সংকোচ বা লজ্জাবোধ করত না। রক্ষইঙ্গ শব্দটি মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখায় 'আরখং' বা 'রাখাংগ' রূপ লাভ করে। অনেক ঐতিহাসিক আরাকানকে 'আরখং' বা 'রাখাংগ' নামে অভিহিত করেন। কারো মতে, আরাকান নামটি ইউরোপীয়দের দেওয়া, এটি রক্ষইংগা, আরখং বা রাখাংগ থেকে আরাকানে পরিণত হয়। এই আরাকানে বসবাসকারীদেরই রোহিঙ্গা বলা হয় এটা কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন। অনেক গবেষক মনে করেন 'রহম' থেকে 'রোহিঙ্গা' এসেছে। আরবীয় মুসলমানেরা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এই এলাকায় তীরে ভিড়লে 'রহম' 'রহম' শব্দ উচ্চারণ করে স্থানীয় মানুষদের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। 'রহম' শব্দের অর্থ দয়া করা'। স্থানীয় মানুষরা মনে করতেন এরা রহম জাতির লোক। 'রহম' শব্দটি বিকৃত হয়ে 'রোয়াং' এবং 'রোয়াং' থেকে 'রোহাংগ' 'রোসাঙ্গ' ও 'রোহিঙ্গা' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। রাখাইন বা আরাকান বার্মার একটি রাজ্য। এখানেই রোহিঙ্গাদের বাসভূমি। একসময় স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। বার্মার সরকারের দাবি এবং কিছু ঐতিহাসিকও মনে করেন রোহিঙ্গারা রাখাইনের কোনও ঐতিহ্যবাহী নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী নয়, তারা বহিরাগত এবং বৃটিশ আমলে রাখাইনে বসতি গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই বক্তব্য সত্য নয়। আরাকানে রোহিঙ্গাদের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। এই এলাকায় প্রথম ইসলাম ধর্মের আর্বিভাব ঘটে অষ্টম-নবম শতাব্দীতে। তখন এখানে শাসনকাজ চালাতেন চন্দ্রবংশীয় হিন্দু রাজারা। রাজধানী ছিল উজালি, বাংলা সাহিত্যে যা বৈশালী নামে পরিচিত।

রোহিঙ্গা সমস্যার অতীত ইতিহাস

বার্মার রাজা ১৪০৬ সালে আরাকানে আক্রমণ করেন। প্রাউকাউ রাজবংশের রাজা নরমিখলা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং বাংলার রাজধানী গৌড় পালিয়ে যান। এখানেই তিনি ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ইসলাম ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন। গৌড়ের শাসক জালালুদ্দিন শাহ ৫০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে ১৪৩০ সালে আরাকান থেকে বর্মী রাজাকে উৎখাত করেন। নরমিখলা ইতিমধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুহম্মদ সোলায়মান শাহ নাম নিয়ে আরাকান সাম্রাজ্যের রাজা হন। জালালুদ্দিন শাহর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আরাকান গৌড়ের করদ রাজ্যে হয়। তিনি যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে তাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ আউকাউ রাজবংশ। গৌড় থেকে ৫০ হাজার সৈন্য আরাকান সাম্রাজ্য দখলের জন্য পাঠানো হয়েছিল তারা আর গৌড়ে ফিরে আসেনি, আরাকানে চাকরি নিয়ে তারা বসবাস করতে থাকে। গৌড়ের বরদ রাজ্য হিসাবে ১৪৩০ থেকে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আউকাউ রাজবংশ আরাকান শাসন করে। তারপর ১৭৮৪ পর্যন্ত আরাকান স্বাধীন রাজ্য হিসাবে শাসিত হয়। সুদীর্ঘকাল আরাকান আউকাউ রাজবংশ দ্বারা শাসিত ছিল।

আওরঙ্গজেবের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তার ভাই সুজা পরাজিত হন। ১৬৬০ সালে সড়ক পথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার হয়ে তিনি

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

মহান নভেম্বর

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

মার্কস তাঁর মতবাদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই সময় পর্যন্ত বিভিন্ন দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির থেকে নেওয়া অগ্রসরমান বা প্রগতিশীল সৃষ্টি বা ধারণাগুলির নির্যাস থেকে। বিশেষ করে জার্মান দার্শনিক হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক চিন্তাসূত্র, ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডোর অর্থনৈতিক ধারণা ও জমির খাজনা সংক্রান্ত সূত্র, ফরাসী বিপ্লবের অপ্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে রুশো ভলটেয়ার প্রভৃতি দার্শনিকের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা এবং জার্মানীসহ অন্যান্য সমাজবিদ দার্শনিকের সমাজতান্ত্রিক ধারণা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এবং মার্কসীয় মতবাদ সৃষ্টিতে একসঙ্গে আর যাঁর নাম উচ্চারণ করতে হবে তিনি হলেন এঙ্গেলস-মার্কসের পরমবন্ধু ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যিনি অন্যতম রূপকার। বলা বাহুল্য উপরোক্ত বিভিন্ন দার্শনিক সমাজতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা ছিল কাল্পনিক (Utopio Socialist Idea) আর অর্থনীতিবিদেরাও সমাজে শ্রেণী বৈষম্যের বিজ্ঞান সম্মত আর্থ সামাজিক কারণগুলির ব্যাখ্যা ঠিকমতো করতে পারছিলেন না বা পারেনিনি। মার্কসই সর্বপ্রথম দেখালেন বস্তুজগতের দ্বান্দ্বিক বিকাশের ন্যায় মানব সভ্যতার ইতিহাসেরও দ্বন্দ্বমূলক বিকাশ হয়েছে—তার থেকেই এসেছে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' তত্ত্ব এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে মানুষ কোন ভগবানের অলৌকিক সৃষ্টির ফসল বা ফল নয়। পৃথিবীব্যাপী প্রকৃতিতে বস্তু জগতের বিবর্তনের মধ্য দিয়েই প্রাণের সৃষ্টি—আর তারপর আরো বিবর্তনের পথে আজকের মানুষ প্রজাতি—মানুষের পূর্বপুরুষ আসলে বানর— কোন দেবতা বা ভগবান নয়, আর সেই মানুষ বা মানব সভ্যতার যে দান্দ্বিক বিকাশ সেই প্রাচীন সময় থেকে বিবর্তিত হতে হতে আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা, দাস ব্যবস্থা, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা, বুর্জোয়া ধনী বা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা—তার থেকে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা—যা সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্য অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ইতিহাস শুধু রাজা-উজীর-মন্ত্রী সেনাপতিদের নয় বরং উল্টোটা, ইতিহাসের চালিকা শক্তি আসলে হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম। আর সেই শ্রেণী সংগ্রামই সমাজের বা সমগ্র মানব সভ্যতার অগ্রগতিরও চালিকা শক্তি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত যতগুলি সমাজ ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা ব্যতীত অন্যান্যও প্রতিটি ব্যবস্থাই ছিল শোষণমূলক। মানব সভ্যতা যত এগিয়েছে একটা শ্রেণী থেকে আর একটা শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে ততই বেড়েছে শোষণ—শ্রেণী শোষন উঠেছে চরমে। মুষ্টিমেয় শাসক-ধনিকশ্রেণী বা মালিক—সকলেই অগনিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী মানুষের রক্তশোষণ করেছে। বেড়েছে বৈষম্য—ধনী হয়েছে আরো ধনী, গরিব হয়েছে আরো গরিব। পরবর্তীতে তিনি পুঁজির বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য—তাঁর কথায় পুঁজি হলো মৃত শ্রম—যা শ্রমিকের রক্ত শোষণ করে বেড়ে ওঠে, আর সেই উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই পুঁজির ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা। এতদিন দার্শনিকেরা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন মার্কসের সূত্রায়নে তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো—আর কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে শোষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে মার্কসের উপসংহার বা সিদ্ধান্ত হলো ব্যক্তিগত পুঁজির উচ্ছেদ, প্রাকৃতিক-সামাজিক সম্পদ ও উৎপদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা—সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পূর্বতন রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র কায়েম করা। আর লেনিন সেই মার্কসবাদকে জার শাসিত রাশিয়ায় যা ছিল সেই সময় সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে দুর্বলতম গ্রন্থি সেখানে আরো সৃজনশীল আরো সমৃদ্ধ করে প্রয়োগ করলেন (যা লেনিনবাদ নামে পরিচিত)। মাত্র দশ দিনের মধ্যে সফল হলো পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তকারী মহান নভেম্বর বিপ্লব। এর পূর্বে ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউন গঠিত হয়েছিল, সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণীর সেই বিপ্লব টিকে থাকতে পারেনি। পৈশাচিক হত্যালীলা চালিয়ে রক্তের বন্যায় শ্রমিকদের ডুবিয়ে দিয়ে বুর্জোয়ারা সেই বিপ্লবকে ধ্বংস করে ঘোষণা করেছিল ''সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। প্যারি কমিউন ধ্বংস হয়েছে, আর মার্কস বলেছিলেন, প্যারি কমিউন ধ্বংস হলেও তার বিপ্লবী মর্মবস্তু বা আদর্শকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়—তার মৃত্যু নেই।'' আগামীতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বহারাদের রাজ কায়েম করা সম্ভব। লেনিন 'প্যারি কমিউন' থেকে এই শিক্ষা নিয়েছিলেন যে সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী কৃষক সমাজকে বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করেনি। আর তারা ধ্বংস করেনি পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্র। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতি বিপ্লবীরা কৃষক সমাজকে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পেরেছিল। রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে একইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছিল কৃষক সমাজ পাশে দাঁড়ায়নি বলে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ও অভিজাত সামন্ততন্ত্রের পতনের পর, (এখানে উল্লেখ করা দরকার যে রাশিয়াতে সেই সময় কেবল জারের হাতেই ছিল ৮০ লক্ষ হেক্টর জমির মালিকানা। আর অভিজাত সামন্তদের হাতে লক্ষ কোটি হেক্টর জমি ছিল। ছিল সার্ক বা ভূমিদাস প্রথা, প্রকৃত কৃষকের হাতে কোন জমি ছিল না।) সেখানে তখনও পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়নি। কেরেনস্কির নেতৃত্বে বুর্জোয়াদের সরকার তখন ক্ষমতায় আসীন। লেনিন গ্রামের গরিবদের প্রতি বইতে কৃষক সমাজের করণীয় ব্যাখ্যা করলেন সুইজারল্যান্ডে নির্বাসন থেকে ফিরে তাঁর বিখ্যাত ''এপ্রিল থিসিসে'' দেখালেন গ্রাম এবং শহরের সর্বহারাদের নেতৃত্বেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস সাধন ও উচ্ছেদ সম্ভব। অর্থাৎ বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক দৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে মাত্র দশ দিনের মধ্যে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণী মহান নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত করতে সক্ষম হলো—নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অর্থাৎ বিপ্লবের প্রথম পর্যায় জার ও অভিজাতদের উচ্ছেদ সাধনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেরেনস্কি সরকারের। (পুরানো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর বিপ্লব) আর নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

(এরপর পরবর্তী সংখ্যায়)

রোহিঙ্গা সমস্যা প্রসঙ্গে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

আরাকানে পলায়ন করেন। তৎকালীন রোসাং রাজা চন্দ্রবৃক্ষ সুধমা বিশ্বাসভঙ্গ করে সপরিবারে তাঁকে হত্যা করেন। এরপর শুরু হয় দীর্ঘমেয়াদী অরাজকতা। বার্মার রাজা বোডপায়া আরাকান দখল করেন ১৭৮৪ সালে। প্রথমে আরাকানিরা রাজাকে সমর্থন জানালেও অচিরেই তাদের বিশ্বাসভঙ্গ ঘটে। বার্মিজরা আরাকানের উপর নির্বিচারে আক্রমণ চালায়। তাদের মধ্যে বৌদ্ধ, মুসলমান উপজাতি সবাই ছিল আক্রান্ত। লক্ষ লক্ষ মানুষ আরাকান ছেড়ে পালায়। আরাকানীদের দলবদ্ধভাবে দেশান্তরের পর্ব শুরু হয় এই সময় থেকে। দেশন্তরীরা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল—বৌদ্ধ মগ ও রোহিঙ্গা মুসলমান। মগরা পার্বত্য এলাকায় এবং রোহিঙ্গারা চট্টগ্রামে ঘাঁটি গাড়ে। ১৮২৬ সালে বৃটিশরা বার্মিজদের হারিয়ে দেবার পর মগ ও রোহিঙ্গারা দেশে ফেরে। কিন্তু শাসকবর্গের বিভাজনের রাজনীতির শিকার হয় রোহিঙ্গারা। শাসকগণ বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে বলে দেশে প্রত্যাবর্তন আর রোহিঙ্গা মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ। সংঘাত শুরু এখান থেকে। যা নানাভাবে নানা মাত্রায় ঘটে চলেছে আজ পর্যন্ত।

সাম্প্রতিককালে অত্যাচার চরমে উঠলেও এই সমস্যা এবং দ্বন্দ্ব বহু বছরের পুরানো। বৌদ্ধ রাজা বাইন-নুঙ্গের (১৫৫০-১৫৮৯) মুসলমানদের উপর হালাল মাংস খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোরবানি করতে বাধা দেয়, জোর করে ধর্মান্তর ঘটায়। ১৯৯২ সালে সামরিক সরকার নি উইন সামরিকবাহিনী থেকে মুসলমানদের বের করে দেন। বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের সময় নির্বিচারে মুসলমান হত্যা হয়েছিল। ২০০২ সালের ১৫ মে টোঙ্গুতে সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে ২০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়, ১১টি মসজিদ ও ৪০০ ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়। ১৯৭৮ সালের বার্মা জুন্টা সরকারের আমল থেকে আক্রমণ আরও তীব্র হয়। বার্মায় বৌদ্ধদের রাখাইন বলা হয়। এদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠি আছে। যারা রোহিঙ্গাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে।

১৯৬২ সালে সেনাপ্রধান নে ইউন ক্ষমতায় এসে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে দমন জোরদার করেন। সামরিক সরকারের কাঠোর দমনমূলক নীতি ঐ অঞ্চলে মুজাহিদিন তৎপরতাকে আবার নতুন করে উসকে দেয়। ১৯৭৪ সালে বিশ্ব মুসলিম আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে রাখাইনে গড়ে ওঠে রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট নামে একটি সশস্ত্র গোষ্ঠি। ১৯৭৭ সালে বহিরাগত ধরার নামে সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার চালায়। দু লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। সারা বিশ্বে শোরগোল পড়ে যায়। পরের বছরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যস্থতায় তাদের বেশিরভাগ রাখাইনে ফিরে আসে। সাময়িকভাবে পিছু হঠলেও ১৯৮২ সালে সেনা সরকার নতুন অভিবাসন আইন বানায়। এই আইনে ব্রিটিশ শাসনকালে আগত সমস্ত ব্যক্তি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। রোহিঙ্গারাও এর আওতায় পরে। ১৯৮২ সালে যে ১৩৫টি জাতিসত্তাকে মায়ানমার রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে তার মধ্যে রোহিঙ্গা নেই।

বর্তমান ঘটনাবলী

মায়ানমারে জাতিগত সহিংসতা মাত্রাতিরিক্ত রূপ নেওয়ার কারণে বিশ্ব জনগণের চাপে এর প্রতিষ্ঠানিক সক্রিয়তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোফি আন্নান কমিশন এ নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেছে। রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার, যাতায়াতের অধিকার, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার ইত্যাদি সুনিশ্চত করার সুপারিশ উপস্থাপনের পরদিনই, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রাখাইনের ৩০টি পুলিশ ও সেনাচৌকিতে হামলা হয়। ৮০ জনের মৃত্যু ঘটে। অভিযুক্ত করা হয় আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি নামক জঙ্গী সংগঠনকে। এর সূত্র ধরেই মায়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নতুনভাবে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতায় হামলা শুরু করে। অতীত ইতিহাস বলছে যে যখনই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়ার খানিকটা সম্ভাবনা দেখা গেছে তখনই রহস্যজনকভাবে সন্ত্রাসী হামলা সংগঠিত হয়েছে।

এই ঘটনার পরে সেনাবাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গা নিধান শুরু হয়। গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, মুণ্ডচ্ছেদ, নির্বিচারে ধর্ষণ এবং আবালবৃদ্ধবনিতার উপর যথেচ্ছ গুলিবর্ষণ—এই সবই চলছে অবাধে। বিগত কয়েকমাসে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিম মায়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে, ভারতে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

এই নৃশংস অত্যাচার যখন চলছে তখন অদ্ভুতভাবে নীরব রয়েছেন রাষ্ট্রের শীর্ষে বসে থাকা নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়িনী অং সান সুকি, যিনি নিজেও অতীতে রাষ্ট্রের দমনপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ১৫ বছর গৃহবন্দী থাকা অং সান সুকি-র এই যথাযথ ভূমিকা পালনে অক্ষমতার কিছু কারণ রয়েছে। ২০১৫ সালে নির্বাচন করিয়ে তাঁকে স্টেট কাউন্সেলর নামে সরকারী ক্ষমতায় আনা হল মায়ানমারের ''মুখোজ্জ্বল'' করতে। সেই সময় যা পরিস্থিতি ছিল তাতে গণতন্ত্রের এই মুখোশ পড়া ছাড়া সে দেশের শাসকদের আর কোন উপায় ছিল না। তবু রাষ্ট্রপতি হতে দেওয়া হল না এক অদ্ভুত নিয়মকে সামনে রেখে। নিয়মটা হল সন্তান মায়ানমারের নাগরিক না হলে অভিভাবক রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। সু কি-র সন্তানরা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, সুতরাং তিনি রাষ্ট্রপতি হবেন না। স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থাকল সেনার হাতে। মায়ানমারে জাতীয় সংসদের ২৫ শতাংশ আসন সেনাবাহিনীর। এছাড়া সবচেয়ে ক্ষমতাধর ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাণ্ড সিকিউরিটি কাউন্সিলেও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই কাউন্সিল যে কোন সময় সংসদ বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। এ কারণে সু কি সহ নির্বাচিত সমস্ত প্রতিনিধিরা এখন পুতুলের মত করেই নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত। তাঁরা যাতে সামরিক প্রশাসনের পুরোনো পথে চলেন, তার জন্য নানা বিধিব্যবস্থা ও হুমকি সক্রিয় আছে।

দ্বিতীয়ত অং সান সু কি-র ভোটব্যাঙ্ক মূলত বার্মার বৌদ্ধরা। ক্রমহ্রাসমান কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য আর্থিক সংকটের কারণে এই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু অন্যান্য জাতিদের আগ্রাসন করতে পিছপা নয়। সু কি এদের চটিয়ে ক্ষমতা থেকে অপসারণের পথ হয়তো প্রশস্ত করতে চাইছেন না।

আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এখানে চীনা তেল কোম্পানি, চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গ্যাস ও তেলের পাইপ লাইন বসানোর কাজ শুরু করেছে, যা রাখাইন পোর্ট থেকে সিট্রে পর্যন্ত যাবে। তার সঙ্গেই তৈরী হবে গভীর সমুদ্র বন্দর ও একটি শিল্পোদ্যান। চীনের পরই মায়ানমারে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের নিরিখে রয়েছে থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর। বিভিন্ন জাপানী কোম্পানী মায়ানমারে শিল্প ও রেল ক্ষেত্রে কাজ করছে। ভারত সরকারও মায়ানমার সরকারের কাছ থেকে সড়ক পরিবহনের জন্য ৪৮৪ মিলিয়ন ডলারের বরাত পেয়েছে। কালাদাম থেকে মিজোরাম হয়ে কলকাতা পর্যন্ত পরিবহন ব্যবস্থা তৈরী হবে। এমনকি বাংলাদেশ সরকারও চট্টগ্রাম থেকে সিট্রে পর্যন্ত চার লেনের রাস্তা তৈরীর বরাত পেয়েছে। সমস্যা হল নয়া উদারনীতির ধ্বজাধারী আমেরিকাকে নিয়ে। আমেরিকা এখানে কোন বরাত পাচ্ছে না। তাই ক্ষিপ্ত মার্কিন প্রশাসন ইউ এন ও সহ নানা ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থাকে দিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যাকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলতে উঠে পড়ে লেগেছে। মায়ানমারের দেশগুলির আর্থিক বিনিয়োগ পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বের সাথে বর্তমান রোহিঙ্গা সমস্যার কোন যোগসূত্র আছে কি না তা ভবিষ্যত বলবে, তবে তার সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ভারতের অবস্থান

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয় শিবিরে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছেন। তবে শিবিরগুলি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। খাদ্য-জল সবই অপ্রতুল। কাদামাটিতে শুয়ে কোনক্রমে দিন কাটাচ্ছেন তারা। বাংলাদেশ সরকার কড়া নজরদারী রেখেছে যাতে কেউ শিবির থেকে অন্য কোথাও যেতে না পারে। এছাড়া শ্রীলংকাতেও রোহিঙ্গা শরণার্থীরা প্রবল কষ্টে আছেন।

ভারত সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত লজ্জাজনক। রোহিঙ্গাদের উপর যখন নির্যাতন চলছে তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মায়ানমার সফরে গেলেও এ প্রসঙ্গে একটা কথাও বলেননি। বিজেপি-আর এস এস যেহেতু মুসলমান বিদ্বেষী এবং রোহিঙ্গারা মুসলমান, তাই তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বার্থেই তারা মায়ানমার সরকারকে পুরোপুরি সমর্থন দেওয়ার পক্ষপাতি। প্রায় ৪০ হাজারের বেশী রোহিঙ্গা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে বলে জানা যাচ্ছে। যাদের মধ্যে ১৬ হাজারের মত নিবন্ধীকৃত। এখন তাদের ভারত থেকে বহিস্কারের জন্য নরেন্দ্র মোদির দলের লোকেরা সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। রোহিঙ্গারা মুসলমান আর মুসলমান মানেই ''সন্ত্রাসবাদী'' এই যুক্তিতে গৃহহীন রোহিঙ্গাদের প্রতি ভারতের এই অমানবিক আচরণ সত্যিই দুঃখজনক। ভারতের বিদেশনীতিও আজ সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট।

বিশ্ব মানবতাবোধ জাগ্রত হোক

রোহিঙ্গা সমস্যা মায়ানমারের সমস্যা হলেও এটা প্রকৃতিগতভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমস্যা। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠি কর্তৃক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির উপর নিপীড়ণ আজকের পৃথিবীতে বিশেষ করে আর্থিক সংকট পরবর্তীতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে ভারত সহ সকল প্রতিবেশী দেশকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাষ্ট্রসংঘকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এই সমস্যার সমাধান অবশ্যই সম্ভব যদি জাগ্রত হয় বিশ্বমানবতাবোধ। □

চাই নিরন্তর সংগ্রাম

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

প্রদর্শন করছেন। অথচ সরকারের প্রাণশক্তি হিসাবে এরাই কাজ করে থাকেন। বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন লাগু না হওয়া সত্ত্বেও সরকারী প্রকল্পগুলি সময় মতো শেষ করছেন, কর্মচারী স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও। বিনিময়ে মিলছে লাঞ্ছনা, হুমকি।

বর্তমান সময়ে প্রয়োজন প্রতিবাদী রূপের পুনরুত্থান ঘটানো—যা আস্তে আস্তে বিকশিত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত সাফল্যের বৃত্ত প্রসারিত হচ্ছে। বিকাশ ভবন অভিযান ও বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণ পথে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৬ নভেম্বরের কর্মসূচীতে বিপুল কর্মচারী জমায়েতে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে কর্মচারীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে আটকানোর চেষ্টা করে। পুলিশী বাধায় দাবি আদায়ে নাছোড় কর্মচারীরা ব্যারিকেডের বাধাকে জয় করে বিকাশভবনের সামনে উপস্থিত হয়ে এই বার্তাই দিয়েছে—বঞ্চনা আর অবজ্ঞার অবসানে যে কোন লড়াই-আন্দোলনেই তারা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পাশে আছে। কোন ধরনের হুমকী বা ভয়ের কাছে মাথা নত না করে দাবি আদায়ে প্রয়োজনে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে। এখন এই প্রত্যয়কে কার্যকরী করতে মনোবলকে বৃদ্ধি করতে হবে ও কর্মচারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। প্রতিবাদের ভাষাকে প্রতিরোধে উন্নীত করেই গণতন্ত্রকে রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে রক্ষা সর্বোপরি জীবন-জীবিকার উপর অসহনীয় আক্রমণের মোকাবিলা করা সম্ভব। এই লড়াই একা ব্যক্তি বিশেষের নয়, সমষ্টির। কর্মচারীদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলন-সংগ্রামে শামিল করার মাধ্যমেই তা সম্ভব। তবে কর্মচারীদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষার প্রশ্নে আগের পরিস্থিতি নেই। শূন্যপদজনিত কারণে প্রশাসনে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আগের মতো প্রতিনিয়ত যোগাযোগের সমস্যাও বাস্তব। এর থেকে উত্তোরণ ঘটাতে চাই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। প্রয়োজনে সর্বক্ষেত্রে সংগঠনকে নিজের কর্মীসত্তা নিয়ে কর্মচারীর সামনে হাজির হতে হবে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৮-তে সংগঠনের নেতৃত্ব সেই সত্তা নিয়েই রাজ্যের প্রতিটি বুকে কর্মচারীর সাথে সাংগঠনিক ভাবনার মত বিনিময় করবেন। একদিকে সাংগঠনিক কাঠামোকে সক্রিয় করা, অপরদিকে কর্মচারীদের আন্দোলন মুখী করে তোলা। কিছুটা আত্মচিন্তা, কিছুটা নিস্পৃহতা, কিছুটা ভীতির পরিবেশ ইত্যাদি বাস্তবতার মধ্যেও নিজেদের এ থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন নিজের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটানো। আমরা জানি বিশ্বায়নের আক্রমণ সর্বগ্রাসী। আজকে তার বিভিন্ন রূপ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হচ্ছে। এই সমস্ত প্রশ্নে প্রতিনিয়ত নিজেকে জাগ্রত রেখেই বিনম্রভাবে সকলের কাছে পৌঁছোতে হবে। ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী শোনাই শুধু কাজ নয়, প্রাপ্ত অবস্থায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কর্মচারীকে দিশা দেখানো। কাজের পূর্ণতা পাবে তখনই, যখন সমস্ত ভয়ভীতি, সংশয় কাটিয়ে সহমতে আনা কর্মচারীকে আন্দোলনের রাস্তায় নিয়ে আসতে পারবো। এটা সম্ভব যদি আমি নিজেই প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করে কর্মচারীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পারি—যার চেষ্টায় হাজার হাজার কর্মী নেতৃত্ব সচেষ্ট রয়েছেন।

স্মরণে রাখা প্রয়োজন অধিকার অর্জনের জন্য একটি বা দুটি কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। লাগাতার কর্মসূচীর মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রেণী সংগ্রাম হল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। যা সবসময় সরলরেখা ধরে চলে না। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে সম্ভাবনার বীজ। স্বৈরাচারীরা ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে স্বেচ্ছাচার ডেকে আনে যা ইতিহাসে বারে বারে প্রমাণিত। স্বৈরাচারীর লক্ষ্যই হলো নিজের স্বার্থে বিরোধীদের দমন করতে ক্রমশ আরও স্বৈরাচারী হতে হয়। মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও আস্তে আস্তে তারা দাঁত, নখ নিয়ে প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত উপাঙ্গকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু গণতন্ত্র বরাই নির্মম। সে তার পথ বের করে নেয়। তাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ ছাড়া বিকল্প পথ নেই। আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিরোধের জন্য মাথা তুলতে হবে আমাদের কেই। পরিবার-পরিজনসহ কর্মচারী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনে আসুন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই। □

জাতীয় অর্থনীতির উপর অক্রমণ

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

আই বিলকে বিচার করা ঠিক হবে না। **দ্বিতীয়ত,** এই সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার। কেন্দ্রীয় সরকার ও এ রাজ্যের সরকারসহ বিভিন্ন রাজ্য সরকার জনগণের ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেছে। শ্রমিকশ্রেণির ধর্মঘটের অধিকার, দর কষাকষির অধিকার হরণ করার চক্রান্ত চলছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম এবং এফ আর ডি আই বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্য। **তৃতীয়ত,** শ্রমজীবীদের ঐক্য এই লড়াই গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বর্তমানে সঙ্ঘ পরিবারের নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী শক্তি ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে মানুষের ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে যাতে নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে না ওঠে। তাই নব্য উদারনীতি ও এফ আর ডি আই বিলের লড়াইকে জোরদার করতে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জারি রাখতে হবে। **চতুর্থত,** জাতীয় অর্থনীতির উপর আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির আধিপত্য বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় রাজনীতি এবং বিদেশ নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ক্রমবর্ধমান। এটাই নিয়ম। বৈদেশিক নীতির অর্থনৈতিক দিকটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির কাছে আত্মসমর্পণের ফলে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে বৈদেশিক নীতির রাজনৈতিক দিক যা স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ নীতির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, তাও আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ অংশীদার হওয়ার উদগ্র বাসনা যা উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত একাধিক চুক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষের জনগণ যে চতুর্মুখী আক্রমণ অর্থাৎ নব্য উদারনীতি, হিন্দুত্ববাদী আক্রমণ, স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণ এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে পি এফ আর ডি আই বিল তারই অঙ্গ। সুতরাং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এবং সর্বভারতীয় স্তরে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। বিগত পঁচিশ বছর ধরে গড়ে ওঠা এবং বেড়ে চলা সংগ্রামই হবে এই সংগ্রামের প্রেরণা। □

যৌথ সমাবেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের পক্ষে আগামী দিনে শক্তিশালী লড়াই গড়ে তুলতে হবে।

সমাবেশের মূল বক্তা সি. আই. টি. ইউ'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন বলেন সরকারী কর্মচারীদের ৫৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া সত্ত্বেও এ রাজ্যে প্রশাসন চলছে এটাই বিস্ময়কর ঘটনা। বধমান এই উপলব্ধিকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত কর্মচারীদের কাছে নিয়ে গেলে তবেই সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কার্যকরি প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে। নয়া পেনশন ব্যবস্থার বিরোধিতায় ও ঠিকা কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের যে দুটি দাবীতে সমাবেশ হচ্ছে, এই দুটি দাবীকে প্রতিটি কর্মচারীদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। খোলাখুলি রণভূমিতে কর্মচারীদের কাছে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন কে শত্রু, কে মিত্র। শাসকদলের নীতির আড়ালে থাকা রাজনীতিকে উন্মোচিত করা প্রয়োজন। সামাজিক সুরক্ষাকে খতম করতে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-আই. এম. এফ-র নিদানমেনে দেশে দেশে প্রতিটি সরকারই পেনশন ব্যবস্থা, স্থায়ী চাকরির ধারণাকে তুলে দিতে চাইছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নির্দেশ মেনে বিনিয়োগকে দ্রুতগামী করার জন্য প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সুদের হার কমাতে বাধ্য করছে সেই দেশের পুঁজিবাদের তল্পিবাহক সরকার। সঙ্কটে পড়া পুঁজিবাদ উৎপাদনী ব্যবস্থায় মুনাফা না পাওয়ার জন্য মানুষের যাবতীয় সঞ্চয়কে জুয়ার হাতে তুলে দিতে চাইছে। দেশের পেনশন ফান্ডে ফান্ড ম্যানেজার হিসাবে এস.বি.আই. আর এল.আই.সি. ছাড় বেসরকারী পুঁজি মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এইচ.ডি.এফ.সি, আই.সি.আই.সি.আই বা রিলায়েন্সকে নিয়োগ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার পেনশনের দায়িত্ব আর সরকার নেবে না, নিজের পেনশন নিজেই তৈরি করো। একই কায়দায় ই.পি.এফ-র পেনশনকে ক্যাডারের হাতে তুলে দিতে চাইছে, ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সম্মিলিত প্রতিরোধে এখনও তা কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করতে পারেনি। সরকারী দপ্তরগুলিতে ঠিকা কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য স্থায়ী কর্মচারীদেরই সর্বাধিক দায়িত্ব নিতে হবে। পেনশনের ওপর আক্রমণ আর ঠিকাকরণ একই লক্ষ্যে করা হচ্ছে তাহল সামাজিক সুরক্ষাকে ধ্বংস করা। দিল্লীতে তিন দিনের ধরনা কর্মসূচী থেকে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে সমস্তউদারবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় বড় আকারের আইন অমান্য আন্দোলন হবে। ব্যারিকেড দেখে দাঁড়িয়ে বা বসে পড়ে অবস্থান করার আন্দোলন নয়, ব্যারিকেড ভেঙেই আইন অমান্য হবে। এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে তপন সেন বলেন, সাতের দশকের আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের দিনগুলিতেও এরাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা খুন হয়েছেন। মিথ্যা মামলা হয়েছে, চাকরি চলে গেছে তবু লড়াই থামেনি, আজকের আনেআন্দোলনকেও সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। পুরোনো ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করেই বর্তমান রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা পে-কমিশন দপ্তর অভিযানে ব্যারিকেড ভেঙেছেন, স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শহীদ হয়েছেন কাজল ব্যানার্জী। আগামী দিনে ঝুঁকি নিয়েই ধর্মঘটে যেতে হবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের। সমাবেশ মঞ্চে ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত এবং পেনশনার্সদের যুক্ত মঞ্চের আহ্বায়কদ্বয় পাঁচকড়ি নায়েক ও শিবশঙ্কর রায় উপস্থিত ছিলেন। □

শোক সংবাদ

কমরেড বিমল দে

ওয়েস্ট বেঙ্গল নন-মেডিকেল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আমৃত্যু কেন্দ্রীয় কমিটির

সদস্য ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দীর্ঘদিনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড বিমল দে গত ১ জানুয়ারি, ২০১৮ সকাল ৭.৩০ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

সংক্ষিপ্ত জীবন ঃ

কমরেড বিমল দে ১৯৪১ সালে অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় বাসাবাড়ি গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীহরিচরণ দে ও মাতা প্রভাবতী দেবীর তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে বিমল দে মধ্যম সন্তান। বাবার সাথে পরিবার সমেত ৬-৭ বছর বয়স থেকেই কলকাতায় বসবাস ও লেখাপড়া শুরু। লেখাপড়ার সাথে ফুটবল খেলাতেও তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৬২ সালে সিনিয়র এপিডেমিক কন্ট্রোল অফিসে হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট পদে কলকাতায় ৩নং জোনে কাজে যোগদান করেন। এই সময় সংঠনের সাথে পরিচয়। একাত্ম হয়ে ওঠা। স্বাস্থ্যকর্মীদের জীবন যন্ত্রণা লাঘবের জন্য গড়ে ওঠা সংগ্রামে অংশগ্রহণ, সংগঠনের অভ্যন্তরে বিভেদের ও আপোষকামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে আসা। বিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ১৯৭৪ সালে সমিতির নবপর্যায়ে গঠনের সময় কেন্দ্রীয় সভায় যোগদান, ১৯৭৮ সালে বারুইপুরের রাজ্য সম্মেলনে সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে সিউড়িতে সমিতির ৮ম সম্মেলনে কোষাধ্যক্ষ ও পুরুলিয়ায় ৯ম সম্মেলনে সংগঠন সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরই মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে ট্রেড ইউনিয়নসহ আরো বৃহত্তর গণআন্দোলনের প্রথম সারির সৈনিক হয়ে ওঠেন। আমৃত্যু তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি অবিচল ও নিরলস যোদ্ধা ছিলেন। ১৯৭৫ সালে চাকুরিগত প্রমোশনের মাধ্যমে তিনি হেলথ ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন ও হাওড়ার আন্দুলে বদলী হন। ১৯৭৭ সালে জনগণের বিপুল আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকার। সংগঠনের প্রয়োজনে আবার ৩নং জোনে বদলী হয়ে আসেন। সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজনে তিনি রাইটার্স বিল্ডিং সেনিটারি ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন। চাকুরীর শেষদিন পর্যন্ত তিনি ওখানেই স্বপদে আসীন ছিলেন। ২০০১ সালে তিনি চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণ করেন। কমরেড বিমল দে ছিলেন মিষ্টভাষী, সদালাপী ও বাগ্মী নেতৃত্ব ফলে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সমিতির ১১তম সম্মেলনে মেদিনীপুরে তিনি সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমিতির সংগ্রাম আন্দোলন পরিচালনা করেন। সমিতির ১৪তম মুর্শিদাবাদ সম্মেলন পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। সংগ্রাম আন্দোলন ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়নগত পড়াশুনা ও লেখালেখিতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ সম্মেলন থেকে সাধারণ সম্পাদক থেকে সমিতির মুখপত্র ব্রতী ত্রৈমাসিক-এর সম্পাদক হন ও সুদৃঢ়ভাবে মুখপত্রকে দিশা দেখাতে সাহায্য করেন। সপ্তদশ সম্মেলন বাঁকুড়া পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। এই সময়কালে তিনি দীর্ঘদিন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

গত ১৬ জানুয়ারি কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট সভাগৃহে প্রয়াত কমরেড বিমল দের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ সভায় কমরেড বিমল দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও বিভিন্ন সমিতি, কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে এবং এন এম টি ই এ সমিতির বিভিন্ন জেলার পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। সভায় শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির সভাপতি প্রশান্ত ঝা। স্মরণসভায় স্মৃতিচারণা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়। কমরেড বিমল দে-র পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী দে ও একমাত্র পুত্র গৌতম দে উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের পক্ষে স্মৃতিচারণা করেন পুত্র গৌতম দে। □

সুকোমল সেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিখিল পাত্র বলেন, আজকের কঠিন পরিস্থিতিতে শুধু শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন নয়, সমাজ বদলের লড়াই তীব্র করতে কমরেড সুকোমল সেনের শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন সুকোমল সেনের মৃত্যু নেই তিনি আমাদের স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। তার স্মৃতিতে প্রতি বছর আলোচনা সভার আয়োজন করবে এবং সমিতির লাইব্রেরীটিকে পুনর্গঠন করে

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সুকোমল সেনের নামাঙ্কিত করা হবে। তিনি বলেন সমিতির মুখপত্র শরিকের সাথে সুকোমল সেনের সম্পর্ক ছিল নাড়ির সম্পর্ক। তিনি এই পত্রিকাকে অভিভাবকের মতো লালন করতেন এবং এই পত্রিকা ৫০ বছরে পদার্পণ করেও তার নামেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

এই স্মরণ সভায় সারা ভারত কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন শুধুমাত্র রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলন নয়, সর্বভারতীয় কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের মুখপত্র এমপ্লয়ীজ ফোরামের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন প্রায় মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত। এমপ্লয়ীজ ফোরাম আজ সারা ভারতে একমাত্র এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মচারীদের মুখপত্র। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিয়মিত মতাদর্শ চর্চা চালিয়ে গেছেন তাঁর অজস্র তাত্ত্বিক লেখার মধ্য দিয়ে। ডব্লিউ.এফ.টি.ইউ-র মঞ্চে, আন্তর্জাতিক কর্মচারী আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। নয়া উদারনীতি কিভাবে সরকারি ক্ষেত্রে ব্যাপক ঠিকাকরণ—স্থায়ী চাকরিকে ধ্বংস করছে, তা প্রথম তিনিই তত্ত্বায়িত করেন। নয়া পেনশন সংস্কারের বিরুদ্ধে নয়ের দশকের মধ্যভাগ থেকেই তিনি সোচ্চার ছিলেন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন, ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের পর বামপন্থী আন্দোলন ও কর্মচারী আন্দোলনের উপর যে ধরনের আক্রমণ নামিয়ে আনা হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের কেন্দ্রীয় ধর্মঘটের সময় তিনিই উৎসাহ দিয়েছিলেন এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের সাহসের সাথে ধর্মঘটে অংশ নিতে। তাঁর শিক্ষা ছিল শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণই সেরা রক্ষণ। আজকের কঠিন সময়ে যখন এ রাজ্যে গণতন্ত্র আক্রান্ত, আন্দোলন করতে গিয়ে সরকারী কর্মচারীরা আক্রান্ত হচ্ছে, মৃত্যু ঘটছে, সেই সময় সুকোমল সেনের দেখানো পথেই আমাদের সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। সর্বভারতীয় নেতৃত্ব মঞ্জুল দাস বলেন, তিনি এটা বুঝে ছিলেন শুধু বাংলা বা ত্রিপুরা থেকে নয়, কর্মচারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে প্রসারিত করতে হলে হিন্দী ভাষী অঞ্চলের শ্রমিক কর্মচারী সমাজের কাছে তাকে পৌঁছাতে হবে। তাই তিনি প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলোতে কর্মচারী নেতৃত্বের সাথে মিলিত হয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন দেশের গণ আন্দোলনকে বামপন্থী মতাদর্শে সংগঠিত করতে হলে হিন্দী ভাষাকে করায়ত্ব করতে হবে। তাই তিনি অল্প সময়েই হিন্দি ভাষাকে শিখে সাবলীলভাবে হিন্দিতে বক্তব্য রাখতে পারতেন। তাই হিন্দী ভাষী অঞ্চলে সুকোমল সেন ছিলেন তাদের কাছের মানুষ ও নিজের লোক। অজয় মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্মরণ সভায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও লিখিত শোকবার্তায় এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারী আন্দোলনকে সংগঠিত করা ও তাকে পরিচালনা করার জন্য কমরেড সেন সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ তৎকালীন সময়ে বারবার শাসকশ্রেণীর দ্বারা বিভিন্ন প্রশাসনিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। ১৯৭০ সালে সর্বভারতীয় ধর্মঘট সংগঠিত করার অপরাধে ১৯৭১ সালে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময় কমরেড সেন সহ মোট ১৩ জন সরকারী কর্মী নেতৃত্ব সংবিধানের ৩১১(২)(গ) ধারায় চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ চাকুরি ফিরে পান। কমরেড সেন ১৯৮২ সালে চাকুরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করে বামপন্থী শক্তির প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি সাংসদ ছিলেন। সংসদে থাকাকালীন তিনি শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

কমরেড সুকোমল সেনের মৃত্যুতে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস গভীর শোক জানিয়েছে। গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি ও কিউবার রাষ্ট্রদূত শোকবার্তা পাঠিয়ে বলেছেন, তিনি তাঁর জীবনের বড় সময়টাই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে নিবেদিত করেছিলেন। কমরেড সেন ছিলেন অসামান্য বক্তা। পরিস্থিতির গভীরে ঢুকে তার বিশ্লেষণ এবং করণীয় প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল শিক্ষণীয়। সর্বভারতীয় সম্মেলনগুলিতে ইংরেজী ও হিন্দী যুগপৎ ভাষায় তার প্রস্তাবনা বা জবাবী ভাষণ ছিল প্রতিনিধিদের কাছে এক শিক্ষণীয় সাংগঠনিক প্রাপ্তি।

এই স্মরণ সভায় সুকোমল সেনের ভাই ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ সুবিমল সেন স্মৃতিচারণায় বলেন, খুব অল্প বয়স থেকেই বামপন্থী রাজনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সুকোমল সেন যুক্ত হয়ে পড়েন। বেঙ্গল পটারীর শ্রমিক কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন সুকোমল সেন। ১৯৪৬ এর দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই সুকোমল সেন যুক্ত হয়ে পড়েন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে। অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দিলেও, বইপত্র চর্চা ও মতাদর্শ চর্চার প্রতি ছোট থেকেই তাঁর ছিল গভীর মনোযোগ। সুকোমল সেনের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাইরে ও শিক্ষামহলে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। তাঁর লেখা ''ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস'', ''মে ডে এ্যান্ড এইট আওয়ারস স্ট্রাগল ইন ইন্ডিয়া'' ইত্যাদি আকর গ্রন্থ দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের কাছে চিরকাল সমাদৃত থাকবে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ''হিস্ট্রী অফ এ. আইএসজিএফ'', ''হিস্ট্রী অফ ডব্লিউ এফ.টি.ইউ'' ইত্যাদি। এছাড়াও তার লেখা সামাজিক রাজনৈতিক অসংখ্য নিবন্ধ রয়েছে। সম্প্রতি অসুস্থ থাকাকালীন নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৯১ সাল বিপর্যয় পর্যন্ত একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

বর্তমানে দেশের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর প্রয়াণ নিশ্চিতভাবেই এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করল। তাই এই স্মরণসভা প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করছে। কমরেড সুকোমল সেন অমর রহে, কমরেড সুকোমল সেন লাল সেলাম। □

দৃষ্টি আকর্ষণ

অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী বিভিন্ন সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় একসাথে প্রকাশিত হবে।—পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
46th Year, 8th-9th Issue, December'17-January'18
Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

এফ আর ডি আই বিল
জাতীয় অর্থনীতির উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সংসদের (২০১৭ সাল) বর্ষাকালীন অধিবেশনের শেষদিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে ফিনান্সলিয়াল রেজলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনসিওরেন্স (এফ আর ডি আই) বিল ২০১৭, উত্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে এটি সিলেক্ট কমিটির বিবেচনাধীন। ১৪৭ পৃষ্ঠার এই বিলকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার সামনে ধর্ণা, বিক্ষোভ, মিছিল, পদযাত্রা প্রভৃতি কর্মসূচী প্রতিপালিত হচ্ছে এবং হতে চলেছে। একদিকে ব্যাঙ্কের কর্মচারী, আধিকারিকরা যেমন এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তেমনই অন্যদিকে শ্রমজীবী জনগণসহ সাধারণ মানুষও এইসব আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। ইতোমধ্যেই সরকারকে কিছুটা পিছু হটতে হয়েছে। এই বিলের পক্ষে সওয়াল করতে আসরে নামতে হয়েছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে। প্রস্তাবিত বিলের বর্তমান কাঠামোটির পরিবর্তন করে সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ের সুরক্ষাকে আরও নিশ্চিত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হবে— এই ধরনের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ধান্দাবাজ ধনতন্ত্রের প্রতিভূ এই সরকারকে বিশ্বাস নেই। আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেলেই, এরা আবার স্বমূর্তি ধারণ করবে। সুতরাং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা একমাত্র জনগণই দিতে পারে। তাই গণসংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে, প্রয়োজনে এই জাতীয় স্বার্থবিরোধী বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ধর্মঘটও করতে হবে। আলোচ্য নিবন্ধে এফ আর ডি আই বিলটির প্রেক্ষাপট, এই বিলের ক্ষতিকারক দিকগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভাবও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এক

এফ আর ডি আই বিলে একটি ফিনান্সিয়াল রেজলিউশন কমিটির (এফ আর সি) গঠনের প্রস্তাব আছে। এই কমিটির অধিকাংশ সদস্যই হবেন কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত। এই কমিশনের উপর বিপুল ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। কোনো ব্যাঙ্ক দেউলিয়া বা 'রুগ্ন' মনে হলে তাকে বন্ধ করে দেওয়া বা অন্য কোনো ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার ক্ষমতা এই কমিটির থাকবে। এক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানোও যাবে না। এমনকি সংসদেও তা আলোচনা করা যাবে না।

এই বিল বিস্তৃতভাবে আলোচনার পূর্বে এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। কারণ এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমনকি এই বিল কেন্দ্রীয় সরকারের মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। এর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ।

২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাবপ্রাইম সঙ্কট শুরু হয়। এর পরিণতিতে একটার পর একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যাঙ্ক, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক, বীমা, পেনশন ফান্ড, হেজ ফান্ড প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যায়। এইসাথে এই মন্দা দীর্ঘস্থায়ী চেহারা নিয়ে ইউরোপ সহ পুঁজিবাদী দেশে অপরাপর ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বেইল আউট প্রথা অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ সরবরাহ করে এইসব দেউলিয়া বা প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সংস্থাগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে লেমন ব্রাদার্স, ফ্রেডিম্যা, ফ্রেডিসে, এ আই জি প্রভৃতির ন্যায় ব্যাঙ্ক বীমা সংস্থাগুলিকে সর্বমোট করা হয়েছিল ১৩ লক্ষ কোটি ডলার বেইল আউট প্যাকেজের সহায়তা। এর অর্থ হলো এটাই যে বেইল আউট প্যাকেজের মাধ্যমে কর্পোরেশনের দেউলিয়া দশাকে জাতীয় দেউলিয়া দশায় পরিণত করা। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে অবস্থাকে সামলে দেওয়া যায়নি। দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলি কর্পোরেট সংস্থাগুলির দেউলিয়া অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেরাই দেউলিয়া দশায় পড়ে যায়। গ্রীস হলো এর বড় উদাহরণ।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি 'ব্যয় সঙ্কোচন নীতি' গ্রহণ করে। এর মূল বিষয় হলো যে সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় সঙ্কোচন। এর ফলে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয় তুমুল বিক্ষোভ। পরিণতিতে কোথাও কোথাও সরকারের পরিবর্তন ঘটে। আবার কোথাও কোথাও (যেমন ফ্রান্সে) মূলস্রোত ধারার রাজনৈতিক দলগুলি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে থাকে। এই সময় আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল ব্যাঙ্কসহ আর্থিক ব্যবস্থা যাতে ভেঙ্গে না পড়ে। ২০০৯ সালে এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় আর্থিক স্থিতিকরণ পর্ষদ (ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি বোর্ড) বা এফ এস বি। জি-২০ গোষ্ঠীর দেশ হিসেবে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ব্রিসবেন শীর্ষ সম্মেলনে এফ এস বি প্রস্তাবে রাজি হয় ভারত। ব্রিসবেন প্রস্তাবে বলা হয় ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে প্রত্যেক দেশে স্বতন্ত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে। এই সংস্থা ব্যাঙ্কগুলিকে দেউলিয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে এবং তার মধ্য দিয়ে আর্থিক ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতাকে রক্ষা এবং ভবিষ্যতে আর্থিক সঙ্কটকে প্রতিরোধ করবে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে ২০০৮-এর সঙ্কটের সময় ভেঙে পড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করতে 'বেইল আউট' প্যাকেজের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে কর্পোরেট ঋণকে কার্যত রাষ্ট্রীয় ঋণে পরিণত করা হয়েছিল, যা শেষপর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতিকে সঙ্কটগ্রস্ত করে তুলেছিল। একে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্কও সৃষ্টি হয়। কোনও কোনও বিশ্বায়ন সমর্থক অর্থনীতিবিদ প্রশ্ন তোলেন যে সরকার কেন হস্তক্ষেপ করবে? কারণ এটি বাজার অর্থনীতির নিয়মের বিরুদ্ধ। এই সঙ্কটমোচনের দায়িত্ব বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক। অপর একাংশ অর্থনীতিবিদ এর জন্য বাজার অর্থনীতিকে দায়ি করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপর জোর দেন।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত এফ এস বি চালু করা হয়। এর বিবিধ প্রস্তাবের অন্যতম হলো 'বেইল আউট'-এর পরিবর্তন 'বেইল ইন' চালু করা। এর অর্থ হলো কর্পোরেটগুলির বিপুল পরিমাণ ঋণ খেলাপির জন্য ব্যাঙ্কগুলির যে লোকসান হবে তার দায় বর্তাবে সঞ্চয়কারীদের উপরে, যাদের বৃহদাংশই শ্রমজীবী জনগণ। এটি সুনিশ্চিত করতে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় ইচ্ছামতো তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। এর ফলে ব্যাঙ্কের নগদ ও ঋণের অনুপাতের উন্নতি হবে এবং ব্যাঙ্কের কোষাগার অর্থ জমার মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্কের সহায়তা হবে। দেউলিয়া থেকে বাঁচতে প্রথমে এই 'বেইল ইন' প্রথা প্রথমে প্রয়োগ করা হয় ২০১৩ সালে সাইপ্রাসে, পরে গ্রীসে। বলাই বাহুল্য কোথাও এটি সফল হয়নি। এফ আর ডি আই-এর একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট।

ভারতে নব্য উদারনীতির প্রয়োগ ১৯৯১ সাল থেকে শুরু হয়; কিন্তু ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর, তা অর্জন করে এক নতুন মাত্রা। জি-২০ বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে আর্থিক নিষ্পত্তি এবং আমানত বীমা নিগম (ফিনান্সিয়াল রেজলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন বা এফ আর ডি আই সি) বিল ২০১৬ প্রস্তুত করার দায়ত্ব অর্পন করা হয়। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিটি তার রিপোর্ট জমা দেয়। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কিছুটা নতুন ফর্মে এফ আর ডি আই বিল ২০১৭ নির্মিত হয়েছে। এটি হলো বিলটির আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। সেই অর্থে বিলটি হলো বিশ্বায়নের সন্তান।

দুই

১৯৯১ সাল থেকে নব্য উদারনীতির পথ ধরে আর্থিক ব্যবস্থা বিশেষত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সংস্কারের নামে কেন্দ্রীয় সরকার ডজনখানেক কমিটি বা কমিশন গঠন করেছে। ১৯৯১ সালের ১৪ আগস্ট এম নরসিংহমের নেতৃত্বে 'কমিটি অব ফিনান্সিয়াল সিস্টেম' গঠিত হয় যা নরসিংহম কমিটি বলে পরিচিত। এই কমিটি তিন মাস পর অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। অবশ্য এই তিন মাস সময় বেশি ছিল। কারণ এর পূর্বে ঐ বছরেরই ১৭ জুন ভারতীয় ব্যাঙ্ক শিল্প সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের সুপারিশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়। নরসিংহম কমিটির সুপারিশ ছিল বিশ্বব্যাঙ্কের এই প্রতিবেদনের ভারতীয় সংস্করণ মাত্র। যাই হোক নরসিংহম কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল (১) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। (২) নতুন করে কোনও ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা চলবে না এবং দেশি-বিদেশী বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে অবাধে প্রবেশ করতে দিতে হবে। (৩) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, স্বনিযুক্ত ও দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলিকে কম সুদে ঋণ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। (৪) ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি করতে হবে। (৫) ব্যাঙ্কের খেলাপী ঋণ (এন পি এ)-এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককেই নিতে হবে এবং ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ থেকে সমপরিমাণ অর্থ সরিয়ে রাখতে হবে। (৬) ব্যাঙ্কের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ব্যাপক হারে কম্পিউটারের ব্যবস্থা করতে হবে।

নরসিংহম কমিটির সুপারিশগুলির সব থেকে বিপদজনক দিকটি হলো এই যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মূল লক্ষ্য হিসেবে এতদিন ধরে চলে আসা বাণিজ্যিক লাভ ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার পরিবর্তন করে উচ্চশ্রেণীর স্বার্থে বিশেষত পুঁজিপতিদের লুঠের ক্ষেত্র হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে ব্যবহার করা। এক কথায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গণব্যাঙ্কিং (মাস্ ব্যাঙ্কিং থেকে শ্রেণি ব্যাঙ্কিং, ক্লাস ব্যাঙ্কিং)-এ রূপান্তরিত করা হয়। যাই হোক নরসিংহম কমিটির সুপারিশের সূত্র ধরে ১৯৬৯ সালের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইনকে পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সরকারি মালিকানা ৫১ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। এর সূত্র ধরে শুরু হলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি অভিযান।

এখানেই শেষ নয়। ২০০০ সালে কেন্দ্র বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার সংসদে এক আইন অনুমোদন করায়। এই আইনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সরকারি মালিকানা ৫১ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশে নামিয়ে আনা যাবে। এমনকি এই আইনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বেসরকারি অংশীদারত্বের পরিমাণ এক শতাংশ বৃদ্ধি করে দশ শতাংশ করা হয়। পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কারের নামে যে সমস্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিতীয় নরসিংহম কমিটি, তারাপোরে কমিটি, রঘুরাম রাজন কমিটি, আনওয়াবাল হুদা কমিটি, আর বি আই ওয়ার্কিং গ্রুপ, পি জে নায়েক কমিটি (২০১৪) প্রভৃতি। এদের মধ্যে পি জে নায়েক কমিটির রিপোর্টটি সব থেকে বেশি ক্ষতিকর। এই রিপোর্টের সুপারিশ হলো ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট কমিটি গঠন করে (বি আই সি) ব্যাঙ্কের সরকারি অংশীদারত্বের অংশকে এখানে স্থানান্তরিত করা। বি আই সি গঠন সাপেক্ষ আপাতত ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো (বি বি বি) গঠন করতে হবে। বি আই সি ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সরকারি অংশীদারত্বের পরিমাণ ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। এইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করা হবে।

নব্য উদারনীতির ২৫ বছরে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কার (সংহার)-এর নামে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে, তার মূল বিষয় হলো— (১) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সরকারি অংশীদারত্বের পরিমাণ কমিয়ে আনা; (২) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ / অধিগ্রহণ; (৩) বেসরকারি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ; (৪) বিদেশি ব্যাঙ্কের অবাধ প্রবেশ; (৫) শিল্পপতি ও কর্পোরেট হাউসগুলিকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান; (৬) ব্যাঙ্ক শিল্পকে কোম্পানী আইনের অন্তর্ভুক্ত করা; (৭) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অংশীদারত্বের সমানুপাতে ভোটাধিকার প্রদান; (৮) বেসরকারি ব্যাঙ্কে বিদেশি পুঁজির ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি; (৯) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা খর্ব করা; (১০) ব্যাঙ্কের কাজকর্মে আউট সোর্সিং করা; (১১) ব্যাপক কর্মী সঙ্কোচন।

উপরিউক্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটের পথ ধরেই এফ আর ডি আই বিল ২০১৭ নির্মিত হয়েছে।

তিন

এই বিলটি ২০১৭ সালের ১৪ জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং বাদল অধিবেশনের শেষদিনে তা সংসদে পেশ করা হয়। এই বিল আইনে পরিণত হলে সেই আইনের দ্বারা গঠিত হবে ফিনান্সিয়াল রেজলিউশন কমিশন (এফ আর সি), যার ব্যাঙ্ক বা বীমার সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন তার 'রুগ্নতা, 'দেউলিয়া পূর্ব' অবস্থা বিবেচনা করার এক্তিয়ার থাকবে। এই কমিশনের অধিকাংশ সদস্যই কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত। ব্যাঙ্ক বীমা বা আর্থিক সংস্থা রুগ্ন হয়ে গেলে প্রধানত তিন ধরনের ব্যবস্থার সুপারিশ সংস্থাটি করতে পারবে। প্রথমত, যে কোন ব্যাঙ্ক, বীমা সমবায় ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ, দেউলিয়া ঘোষণা বা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। অর্থাৎ এস বি আই, জীবনবীমা কর্পোরেশন সহ সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মীই এখন আক্রান্ত বা আক্রমণের সম্মুখীন। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত না দিয়ে মেয়াদ বৃদ্ধি, সংস্থার শেয়ার ইকুইটি সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে নিতে বাধ্য করা। তৃতীয়ত, এই সংস্থার সিদ্ধান্ত কোনো সরকারি প্রশাসনিক সংস্থা বিরোধিতা বাতিল করতে পারবে না প্রভৃতি। সেই সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে না। এমনকি এফ আর সি'র সিদ্ধান্ত সংসদে পর্যন্ত আলোচনা করা যাবে না। চতুর্থত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের 'রুগ্ন'তা দূর করার নামে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মচারী ছাঁটাই, বদলি, বেতন সঙ্কোচন, বেতন চুক্তি পিছিয়ে দেওয়ার ন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। পঞ্চমত, এই আইনের মধ্য দিয়ে ১৯৬১ সালে প্রণীত ডিপোজিট ইনসিওরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন (ডি আই সি জি এস) অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। বর্তমানে ডি আই সি জি এফ-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে গেলে, সঞ্চয়কারীর সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা বীমা করা যায়। দেউলিয়া হয়ে গেলে এই অর্থ সঞ্চয়কারী পেতে পারে। এফ আর সি গঠিত হলে এই সুবিধা আর থাকবে না। ব্যাঙ্ক শিল্প জাতীয়করণের পর অন্তত ২৫টি দেউলিয়া বেসরকারি ব্যাঙ্কের দায়িত্ব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক গ্রহণ করেছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ককে ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স কর্তৃক অধিগ্রহণ।

এখন প্রশ্ন হলো কেন এই এফ আর ডি আই বিল ২০১৭-এর বোঝা দেশের সাধারণ মানুষকে বহন করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক খেলাপী ঋণের (এন পি)-এর বোঝার পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। ওপরের সারণীতে উল্লিখিত হয়েছে (কোটি টাকায়)।

২০১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাণিজ্যিক গ্রস এন পি এ'র পরিমাণ প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকা। এই পরিমাণ মোট অগ্রিমের ৯.৯৬ শতাংশ। এর মধ্যে আই ডি বি আই'এর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ২৪.১১ শতাংশ। আই ও বি'এর ২৩.৬০ শতাংশ, ইউকো ব্যাঙ্কের ১৯.৮৭ শতাংশ।

পূর্বোক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এন পি এ'র পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মোট এন পি এ'র ৮৮.৪ শতাংশ তাদের কাছে রয়েছে, যারা পাঁচ কোটি বা তার বেশি পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে ১২ জন সর্ববৃহৎ ঋণ গ্রহণকারীদের কাছে রয়েছে মোট খেলাপী ঋণের এক-চতুর্থাংশ।

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
মোট (গ্রস) এনপিএ	১,৬৪,৪৬২	২,২৭,২৬৪	২,৭৮,৮৭৭	৫,৩৯,৯৫৬	৬,৪৪,৭৩৩
নীট এন পি এ	৮৯,৯৫০	১,৩০,৩৬০	১,৫৯,৯৭৩	৩,২০,৩৭৬	৩,৮৩,০৮৯

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এন পি এ উদ্ধারের জন্য সংসদীয় কমিটি ঋণ খেলাপীদের গ্রেপ্তার, সম্পত্তি ক্রোক, ব্যাঙ্কের উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ববদ্ধ করা সহ ডজন খানেক সুপারিশ করেছিল; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যেসব পদক্ষেপ কার্যকর করার পরিবর্তে সমস্ত দায় সঞ্চয়কারীদের উপর চাপিয়ে দিতে চলেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত, ঠকবাজ শিল্পপতিদের পাপ দেশের সৎ নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

চার

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে সম্পদের পরিমাণ (৩১ মার্চ ২০১৭) ৯৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৫১৩ কোটি টাকা। মোট জমার পরিমাণ ৮০ লক্ষ ৭৯ হাজার ২১৪ কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ এবং সম্পদের মালিক দেশের জনগণ। দেশি-বিদেশি লুঠেরার দল এখন এই সম্পদ লুঠ করতে উদ্যোগী হয়েছে। লোকসানের অজুহাত দেখিয়ে কোটি কোটি মানুষের শ্রম ঘাম রক্তের বিনিময়ে জমানো অর্থ আত্মসাৎ করতে উদ্যোগী হয়েছে কিছু অসাধুলোক যারা প্রতিপদে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছ থেকে মদত পেতে চলেছে। এ পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়া যায় না একে আটকাতেই হবে।

১৯৯১ সালের পর থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বীমার উপর আক্রমণ করে চলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিলগ্নীকরণের মধ্যেই তাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। একটি ব্যাঙ্কও বেসরকারিকরণ করতে পারেনি। ব্যাঙ্কে বিভিন্ন সঞ্চয়ের উপর সুদের হার ক্রমশ হ্রাস করা হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও ব্যাঙ্কের ৬৫ কোটি গ্রাহকের আস্থায় এতটুকু চির ধরেনি। ব্যাঙ্কের সুদের হার কমিয়ে মানুষকে শেয়ার বাজারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি। এর প্রধান কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা।

দ্বিতীয় কারণ হলো দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগ্রাম। ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী শিক্ষকদের সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকে ১৭টি সর্বভারতীয় ধর্মঘট হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠনগুলি আরও ৩১ বার ৩৬ দিনের ধর্মঘট সংগঠিত করেছে। এই সম্মিলিত প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ২৫ বছর পরও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অটুট আছে।

সুতরাং 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক লাঠে উঠে যাচ্ছে, অতএব সব সঞ্চয় তুলে নিয়ে মাটির নীচে পুঁতে রাখ' এই ধরনের রক্ষণাত্মক মনোভাবের শিকার হয়ে নয়, ২৫ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম থেকে শক্তি অর্জন করে ব্যাঙ্কের সঞ্চয়কারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে তাদেরও এই আন্দোলনে সমবেত করা প্রয়োজন। একই সাথে এই ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে এক প্রকার চালাকিও হচ্ছে।

এক্ষেত্রে অবশ্যই কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। **প্রথমত**, এই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে; কারণ নব্য উদারনীতির সন্তান হলো **এফ আর ডি আই বিল**। সুতরাং নব্য উদারনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে এফ আর ডি

সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।